~ journeybybook.com ~

রবীন্দ্রনাথ রাণু ও শেষের কবিতা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

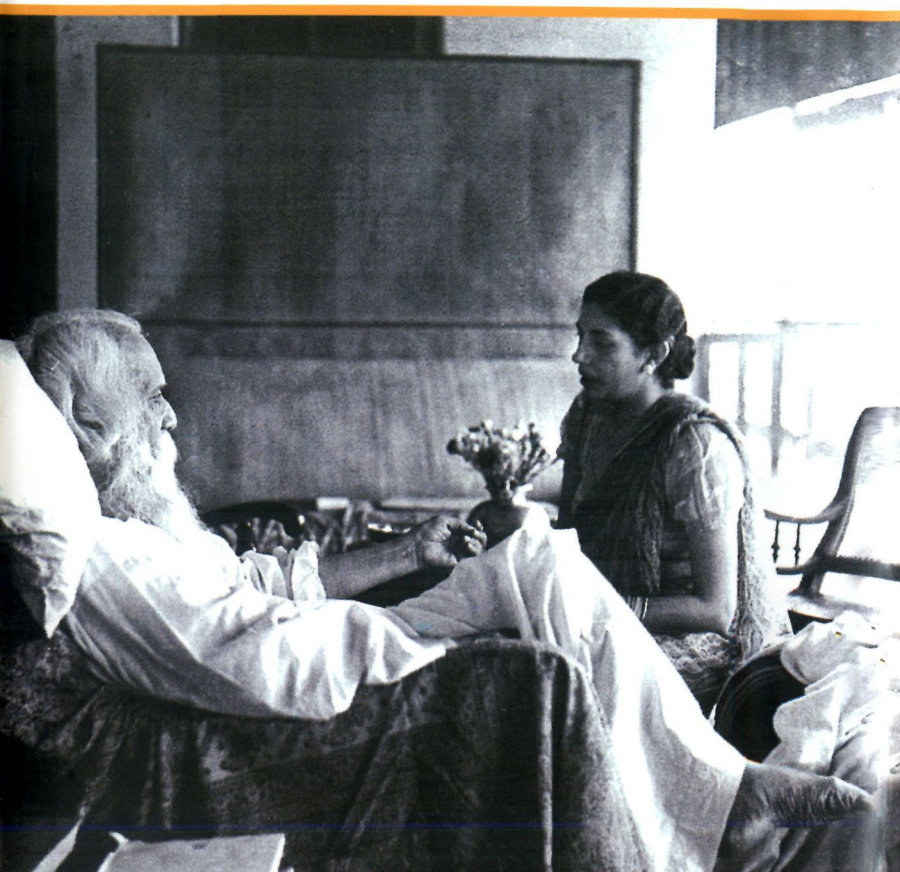

~ journeybybook.com ~

রবীন্দ্রনাথ রাণু
ও
শেষের কবিতা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সাহিত্যম্ ।। কলকাতা
www.nirmalsahityam.com

~ journeybybook.com ~

Rabindranath Ranu O Sesher Kabita
by AMITRASUDAN BHATTACHARYA

প্রথম প্রকাশ
—জানুয়ারি ২০১১
মুদ্রণ সংখ্যা ১১০০ কপি

Sahityam
18B Shyamacharan Dey Street
Kolkata 700073
(033) 2241-9238
(033) 2241-4003
Fax (033) 2219 0466
E-mail : nirmalsahityam@gmail.com
ISBN : 81-????-???-?

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান
নির্মল বুক এজেন্সি
২৪বি কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৭

অক্সফোর্ড বুকস্টোর, ক্রসওয়ার্ড, স্টারমার্ক ও
সমস্ত বই এর দোকান ও হুইলার এ পাওয়া যায়

মুদ্রক
প্রিন্টিং সেন্টার
১ ছিদাম মুদি লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

অলংকরণ : দিনকর কৌশিক

প্রচ্ছদ : ডাটা পয়েন্ট

~ journeybybook.com ~

সাদর উপহার

আমার সময়ের
অন্যতম কৃতী লেখক
সাহিত্যপত্রসম্পাদক
রবীন্দ্রানুরাগী
শ্রী ক ল্যা ণ মৈ ত্র

প্রীতিভাজনেষু

~ journeybybook.com ~

ভূমিকা

গত বছর পুজোর ছুটিতে শিলং পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে পরিচয় হয়েছিল শেষের কবিতার পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ হাতে রবি ঠাকুরে নিবেদিত এক বিদুষী লাবণ্যময়ীর সঙ্গে— আমাকে যে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছিল মেঘের আলয়ে তার প্রাণের ঠাকুরের বহুস্মৃতিবিজড়িত পুরাতন বাড়িগুলি। একদিন অমিত রায় এসেছিল এই শিলং পাহাড়ে, একদিন শেষের কবিতার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এই শৈলাবাসে ; তার পরে গত শতক পেরিয়ে শরতের নীল আকাশের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন থেকে পৌঁছে গিয়েছিলাম অমিত রায়ের রবি ঠাকুরের সেই মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে। সেই ঢেউ খেলানো উঁচুনিচু পর্বতচূড়া, সেই শব্দময়ী বাতাসী পাইনবনের সারি, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ থেকে ভেসে আসা জলভরা মেঘরাশি, কবিগুরুর ব্যবহৃত সেই পুরাতন 'জিৎভূমি' 'ব্রুকসাইড' প্রভৃতি বাড়ি, শৈল সহরে বসবাসকারী সেই পরিশীলিত বাঙালি সমাজ, সপ্তদশী সুন্দরী রাণুকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় প্রাত্যহিক রবীন্দ্রনাথের বৈকালিক ভ্রমণের সেইসব আঁকবাঁকা পাহাড়ি পথ— আমাকে রাণু-রবীন্দ্রের এই আলো-আঁধারি জীবনালেখ্যটি লিখতে গভীরভাবে প্রাণিত করে। আমি নই কবি, শুধু তথ্য দিয়ে সত্যের সুতোয় একটু একটু করে মালা গেঁথে কবিকে স্পর্শ করতে চেয়েছি— 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে।' রবীন্দ্রনাথের প্রেম তাঁর ভালোবাসা তাঁর আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা অথবা নৈরাশ্য ও বিষাদ— সেও আশ্চর্যজনকভাবে একান্তই রাবীন্দ্রিক। ঠিক তেমনই বিস্ময়করভাবে স্বতন্ত্র অমিত ও লাবণ্যর পারস্পরিক চাওয়া-পাওয়ার ব্যতিক্রমী অনন্য প্রেম-সম্পর্ক। কবি উপন্যাস লিখতে লিখতে নিজেই বলেছিলেন লাবণ্য তাঁর খুব চেনা। এদিকে উপন্যাসের মধ্যে 'রবি ঠাকুর'-এর পাতায় পাতায় উপস্থিতিও বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো। কবির নিজের জীবনের কোনো অকথিত পালাই কি তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি শেষের কবিতায় প্রতিফলিত ? তারই অনুসন্ধানে রচিত এই কবি-কাহিনী। এই বইয়ের ভিতরের অলংকরণ করেছেন প্রখ্যাত প্রবীণ শিল্পী শ্রীদিনকর কৌশিক যিনি রবীন্দ্রনাথ ও রাণু দুজনকেই কাছ থেকে দেখেছেন। কৌশিকজিকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। সাহিত্যম্ প্রকাশনা থেকে বইটি সুচারুরূপে প্রকাশিত হল, সংস্থার শ্রীপ্রদীপকুমার সাহাকে জানাই আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

~ journeybybook.com ~

একদিন কলকাতা থেকে সোজা শিলং পাহাড়ে চলে এসেছিল বেড়াতে, শেষের কবিতার অমিত রায়। আর এই শৈলাবাসেই একদিন হঠাৎই এক পাহাড়ের বাঁকে দুটি গাড়ির দৈবক্রমে অপঘাত না-ঘটা মুখোমুখি আঘাতে অমিত ও লাবণ্যর সাক্ষাৎ এবং তা থেকেই পরিণতি ঘটে দূরে চেরাপুঞ্জি থেকে ভেসে-আসা-মেঘে বৃষ্টিস্নাত শিলং-এর বুকে এক আশ্চর্য সুন্দর রোমান্টিক প্রেমের সম্পর্ক। পাহাড়ের গা-জুড়ে পাইন বনের শনশন হাওয়ার মতো, খাদের নিচ দিয়ে কলকল করে বয়ে যাওয়া ঝরনার জলের মতো, সকালে সূর্যোদয়ের সময় পাহাড়ি পাখিদের মধুর কলকাকলির মতোই রমণীয় ছিল তাদের পরস্পরের চাওয়া-পাওয়ার এক আশ্চর্য ব্যতিক্রমী প্রেম। আর ব্যতিক্রমী না হবেই বা কেন ; অমিত রায় তো সাধারণ আর পাঁচজনের

~ journeybybook.com ~

একজন নয়, সে যে আর সকলের থেকে একেবারেই আলাদা। 'পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনও একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম।...কোনও মতে বয়স মিলিয়ে যারা কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে ; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই।' আর সকলে যখন জনতার দার্জিলিংয়ে যায় সে তখন নির্জনতার সন্ধানে একা চলে আসে দূর শিলং পাহাড়ে। সে তো আলাদাই ; 'ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর', কিন্তু গল্পের বই না ছুঁয়ে পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় 'ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মনান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে।' যে মানুষটি সুনীতিকুমারের সঙ্গে শব্দতত্ত্ব নিয়ে তর্ক করতে আগ্রহী এবং যে মানুষটি একজন সৃষ্টিশীল কবিরূপে রবি ঠাকুরকেই তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, যার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য কেবল ঠাকুরবাড়ির আভিজাত্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়— উপন্যাসে সে-নায়ক যে ঔপন্যাসিকেরই প্রতিফলিত সত্তা তা বুঝে নিতে কারওরই অসুবিধা হয় না। শুধু তাই নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনও গল্পে উপন্যাসে কবিতায় নাটকে স্বনামে এমন প্রত্যক্ষভাবে এমন বৃহত্তর ভূমিকায় কোথাও কখনও এমনভাবে উপস্থিত হননি। আগাগোড়া সমস্ত উপন্যাসটাই যেন রবি ঠাকুরের কবিতার এক মোহিনী মায়াজালে মোড়া। 'রবি ঠাকুর' এই নামটাই তো উপন্যাসের প্রায় পাতায় পাতায় এসেছে। সেই রবি ঠাকুরের কবিতার ছড়াছড়ি শেষের কবিতার উপন্যাস জুড়ে। লাবণ্যকে অমিতর পাঠান শেষ কবিতাটি তো রবি ঠাকুরেরই কবিতা— অমিত শেষ মুহূর্তে সে-কথা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হয়নি। রবি ঠাকুর যে লাবণ্যর 'ভালোলাগা' 'ভালোবাসা'র কবি, অমিত তা জানে বলেই লাবণ্যকে লেখা তার শেষ চিঠির শেষ বাক্যে বলে— 'তোমারই কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে।'

এই রবি ঠাকুর এই রবীন্দ্রনাথ শিলং পাহাড়ে একবার এসেছিলেন

~ journeybybook.com ~

এই উপন্যাস লেখার পাঁচ বছর আগে। যারা কুষ্ঠির বিচারে কবির সেদিনের বয়স বিচার করবে তারা বলবে কবির তখন বয়স ছিল বাষট্টি ; কুষ্ঠির বিচারে বাষট্টি হলেও কবি জানতেন তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির বয়স কিছুতেই ছাব্বিশের বেশি নয়। তিনি সত্যিসত্যিই মনেপ্রাণে অনুভব করতেন— বয়সের মাপকাঠিতে নয়, 'দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই— ।' ১৯২৩-এ 'নির্জলা যৌবনের' অধিকারী 'ছাব্বিশ' বছরের রবীন্দ্রনাথ শিলং পাহাড়ে তাঁর সৃষ্ট অমিতর মতোই ভ্রমণ করেছিলেন ইউক্যালিপটাস ও পাইন বনের সুগন্ধী বাতাস গায়ে মেখে এক সপ্তদশী সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে গল্পে কৌতুকে। এ-দৃশ্য সেদিন শিলং-এর বাঙালি সমাজ দেখেছেন ; সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে এই দৃশ্য ধরা আছে। কবির 'অপরূপ রূপ' যাঁরাই সেদিন দেখেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা দুজনকে অসমবয়সি মনে করলেও যে সপ্তদশীটি সেদিন কবির ভ্রমণসঙ্গিণী ছিলেন তাঁর চোখে তাঁর প্রিয় কবিটি ছিলেন চিরকালের জন্যেই 'সাতাশ' বছরের তরুণ। কবি কৌতুক করে বলতেন 'সাতাশ'কে লোকে 'সাতাশি' শুনবে, তার চেয়ে বরং 'ছাব্বিশ' ভালো। শিলং পাহাড়ে রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রমণসঙ্গিণীর নাম রাণু— রাণু অধিকারী।

শুধু স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি অমিততে নয়, রাণু আর লাবণ্যতেও অনেক মিল, আশ্চর্য মিল। যে জায়গায় দুজনের সবচেয়ে বড় মিল তা হল উভয়ের রবি ঠাকুরের প্রতি গভীরতম অনুরাগ। লাবণ্যর ছিমছিমে শরীর ও পোশাকআশাকের সঙ্গে রাণুর সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। শেষের কবিতা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন লাবণ্য তাঁর খুব চেনা। রাণুর ফটোগ্রাফ লাবণ্য নিশ্চয় নয় ; তবে শুধু দুটি নারীতেই নয়— তাদের বাপেদেরও পেশাগত মিল দেখে অবাক হতে হয়। দুজনেই শিক্ষক। 'লাবণ্যের বাপ অবিনাশ দত্ত এক পশ্চিমি কলেজের অধ্যক্ষ।' রাণুর বাবা ফণিভূষণ অধিকারী দিল্লির হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ। দর্শনশাস্ত্রের

~ journeybybook.com ~

এই মানুষটি পরে কাশীর হিন্দু সেন্ট্রাল কলেজে এবং শেষে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। রাণু এবং লাবণ্য উভয়েই 'বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারী'। অমিতর অসামান্য আকর্ষণীশক্তি বেশিক্ষণ লাবণ্যকে আড়ালে রাখতে দেয় না ; অপরদিকে 'সাতাশ' বছরের যুবক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রতি রাণুর তীব্রতম আকর্ষণ। সে আকর্ষণের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না। লাবণ্য-অমিতর ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল খুব দ্রুত এবং ক্ষণসময়ের জন্য। পাহাড়ের বাঁকে হঠাৎ দুজনের দেখা, একে অপরের প্রেমে পড়া, প্রেম ও বিবাহ নিয়ে উভয়ের মূল্যবান অবিস্মরণীয় সব বাক্যালাপ— কথা এবং কবিতা যেখানে একাকার ; এবং তারপরেই শেষ দৃশ্যে হে বন্ধু বিদায়।

কিন্তু রাণু-রবীন্দ্রের পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্কটি অমিত-লাবণ্যর মতো অমন স্বল্প পরিসর সংক্ষিপ্ত নয়, বরং বলা যায় সে-সম্পর্ক যথেষ্টই দীর্ঘ— অনেকদিন ধরে একটু একটু করে গড়ে ওঠা বড় মধুর বিশ্বাসযোগ্য একটি সম্পর্ক। কবির জীবনে রাণুর মতো একজন নারীর আবির্ভাব কবির কাছে পরম সৌভাগ্যের এবং বিধাতার আশীর্বাদের মতো। কবি নিজেই তা মনে করতেন। আট বছরের দীর্ঘ সেই সম্পর্কেরও একদিন ভাঙন ধরল। শোভনলালের সঙ্গে যেমন লাবণ্যের, তেমনি আট বছরের সম্পর্কের শেষে রাণুর সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল শিল্পপতির পুত্র বীরেন্দ্রের। উপন্যাসের সমাপ্তি কেটির সঙ্গে অমিতর এবং লাবণ্যের সঙ্গে শোভনলালের আসন্ন বিবাহের সংবাদের মধ্য দিয়ে। রাণু-রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে জীবন-উপন্যাস তারও পরিসমাপ্তি মূলত রাণুর বিবাহের সম্ভাবনার সংবাদেই।

অমিত-লাবণ্যর প্রেম গড়ে উঠেছিল শিলং পাহাড়ে ; অপরদিকে এই শিলং পাহাড়েই রাণুকে খুব কাছ থেকে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ— টানা প্রায় দেড় মাস, শিলং-এর 'জিৎভূমি' বাড়িতে।

~ journeybybook.com ~

কিন্তু এই 'জিৎভূমি'র আগে রয়েছে 'ব্রুকসাইড'-এর ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ শিলং-এ এসেছিলেন মোট তিনবার। ১৯১৯, ১৯২৩ এবং ১৯২৭-এ। দ্বিতীয়বারের সঙ্গী রাণু। রাণুর বিবাহ হয় ১৯২৫-এ। ১৯২৭-এ শিলং-এ এসে রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখলেন, 'রাণু, শিলঙে এসে পৌঁচেছি। কিন্তু এ আর এক শিলং।' ১৯২৩-এর দিনগুলি ১৯২৭-এ ফিরে আসার নয়। সে-শিলং এ-শিলং কেমন করে এক হবে?

রবীন্দ্রনাথ-রাণুকে ঘিরে শিলং-এর যে ইতিহাস তা ১৯১৯ থেকেই শুরু করা যেতে পারে। কবির সেই প্রথম এই শৈলবাসে আসা।

১৯১৯ সালের ১১ অক্টোবর শনিবার রবীন্দ্রনাথ সেই প্রথম শিলং-এ এসে পৌঁছান।

১৯১৯ সাল মানে তো আজ নয়— আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের কথা। মাস খানেকের জন্যে চেঞ্জে যাচ্ছেন— সুতরাং সেজন্য কিছুটা গুছানোগাছানোর ব্যাপারও তো আছেই। বইপত্র কাগজকলম ইত্যাদি লেখালেখির সাজসরঞ্জামও তো সাজিয়েগুছিয়ে নিতে হবে। বোলপুর থেকে বেরিয়ে রাত্রে কলকাতায় পৌঁছাবেন ; তারপর মাঝে

~ journeybybook.com ~

তিনটে দিন (৬-৮) কলকাতায় যাবতীয় কাজকর্ম সেরে ৯ তারিখ শিলং-এর উদ্দেশে রওনা দেবেন। তা ৫ তারিখ রাত এগারোটায় হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এসে থামল। তখনও তো হাওড়ার ব্রিজ বা 'রবীন্দ্র-সেতু' হয়নি। গঙ্গার উপরে নৌকো সাজিয়ে ভাসমান ব্রিজে লোকে পারাপার করত। পন্টুন ব্রিজ। বেশি রাতে বা জাহাজ চলাচলের সময় সেই ব্রিজ খুলে দেওয়া হত— তখন হেঁটে পারাপারের সুযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ। আলাদা ডিঙি নৌকো ভাড়া করে নদী পার হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা হাওড়ার স্টেশনে নেমে কবি শুনলেন ব্রিজ খুলে দিয়েছে। এখন যেমন স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা হাঁকাহাঁকি করে, তেমনি একশো বছর আগে ডিঙি নৌকোর মাঝি-মাল্লারা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করে যাত্রী সংগ্রহ করত। রাত এগারোটা বেজে গেছে ; অত রাত্রে কোথায় লোকজন কোথায় কুলি বা সহায়ক। মালপত্র ঘাড়ে করে নিয়ে কবি ঘাটে এলেন। তখন সবে জোয়ার এসেছে— ডিঙি নৌকো ঘাট থেকে একটু তফাতে। এত রাত্রে যাত্রী পেয়ে একটা মাল্লা এসে কবিকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চলল। নৌকোর কাছাকাছি আসার মুখে টাল সামলাতে না পেরে কবিকে সুদ্ধ নিয়ে ঝপাস করে পড়ল কাদার উপরে। জলে কাদায় লুটোপুটি খেয়ে সে এক কর্দমাক্ত অবস্থা। গঙ্গার জলে অভিষিক্ত হয়ে ওই অবস্থাতেই মধ্যরাত্রে বাড়ি পৌঁছেছিলেন কবি। ভেবেছিলেন এমন দুর্বিপাক নিশ্চয় শিলং যাত্রার পথে আর ঘটবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিঘ্ন যেন কবির পাশ ছাড়ছিল না কিছুতেই। যেদিন শিলং-এর পথে যাত্রা করবেন সেদিন দেখা গেল সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। আশ্বিনের আঙিনায় খেপার শ্রাবণ ছুটে এল। ২২শে আশ্বিন হলে কী হবে— আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘের আবরণ আর মুষলধারায় বৃষ্টি। 'বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে' রেলে চড়ে বসলেন কবি। কবির সঙ্গে চলেছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ— দিনু ঠাকুর, তাঁর

~ journeybybook.com ~

স্ত্রী কমলা দেবী, এবং কবির সহায়ক ভৃত্য সাধুচরণ। সেইসঙ্গে নানা আকার আয়তনের বাক্স তোরঙ্গ ইত্যাদি তো আছেই।

রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন আগে তাঁর পুরনো গাড়িটা বিক্রি করে একটা নতুন গাড়ি কিনেছিলেন। সেই গাড়িটা অগ্রিম পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল গৌহাটী স্টেশনে— উদ্দেশ্য সেই গাড়িতে চড়ে আরাম করে শিলং পাহাড়ের ওপরে ওঠা যাবে। সেই গাড়ির সঙ্গে বনমালী ও আরও জনা-দুই সহায়ক রওনা হয়ে গিয়েছিল। অনেক কাল পর্যন্তই আসামে যেতে একাধিক ট্রেন বদল করতে হত। ফারাক্কার ব্রিজ তো আমাদের চোখের সামনে হল। এ-ট্রেন সে-ট্রেনের পর সান্তাহার থেকে আসাম মেলে চড়ে বসলেন কবি। ব্রহ্মপুত্রের বুকের ওপর তখন তো আর ওই সুবিশাল ব্রিজ হয়নি ; ব্রিজের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দেখা যায় না এত বড় ব্রিজ। তখন গঙ্গার মতো ব্রহ্মপুত্রেও লোক পারাপার করত ছোট-বড় নৌকোয়। গাড়ি বাস ইত্যাদি পারাপার করত জুড়িন্দা নৌকোয়। অর্থাৎ জোড়া নৌকোয়। এইসব নৌকোগুলো দেখতে ছিল চৌকো, চায়ের ট্রে-র মতো। গাড়িটা জোড়ানৌকোর উপরে এসে দাঁড়াত। বাঁদিকের চাকা বাঁ-নৌকোয়, ডানদিকের চাকা ডান-নৌকোয়। যাত্রীসুদ্ধ গাড়ি নৌকোয় ভেসে ব্রহ্মপুত্র পার হত। ব্রহ্মপুত্রের ওপারে গৌহাটী। কবিকে শিলং পাহাড়ে পৌঁছে দেবার জন্যে গৌহাটীতে কবির গাড়ি অপেক্ষমান।

আশ্বিন শেষের এই শরতেও ঘোর বর্ষা যেন কবিদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কী কলকাতায় কী আসামে! সারারাত জুড়ে বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি ; সেইসঙ্গে মেঘের গর্জন। এইভাবেই সকাল হল, বৃষ্টি আর ট্রেন উভয়ই থামল। যদিও আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। খেয়া জাহাজে কবির দল ব্রহ্মপুত্র পার হলেন। ওপারে গিয়েই মোটরগাড়িতে চড়ার কথা। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের জল অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় ঘাটে মোটর নামতে পারেনি। এদিকে বেলা দু'টো বেজে গেলে পাহাড়ি পথে আর গাড়ি যেতে দেয়

~ journeybybook.com ~

না। আড়াইটের সময় গাড়ি এল। বেলা শেষে পাহাড়ে গাড়ি যাবার অনুমতি নেই। সুতরাং শিলং-এ আজ আর পৌঁছান হল না। সূর্য এদিকে পশ্চিমে ঢলে আসছে। আজকের রাত গৌহাটীতেই কোথাও কাটাতে হবে। এদিকে গৌহাটী শহরের দিকে যাবার পথে গাড়ি গেল বিগড়ে। অনেক কষ্টে যখন পথের ধারে একটা মোটর কারখানায় পৌঁছান গেল তখন সূর্য অস্ত গেছে। মিস্ত্রিরা বললে আজ কিছু করা যাবে না, কাল চেষ্টা করে দেখবে। কাছেপিঠে কোথায় থাকা যায় জিজ্ঞাসা করতে তারা হাত দেখিয়ে দূরে একটা ডাকবাংলোর নিশানা দিলে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল লোকের ভিড় উপচে পড়ছে। একটিমাত্র ছোট ঘর খালি ; কিন্তু তাতে পাঁচজনে থাকা তো অসম্ভব। কী করা যায়! শেষে গোয়ালন্দগামী স্টিমারঘাটে একটা নোঙরকরা জাহাজে কবিরা সবাই আশ্রয় নিলেন। সেখানে কি আর ঘুম হয়? দুই মহিলা প্রতিমা আর কমলা উভয়েরই কাশি আর হাঁপানি। বাইরের আবহাওয়াও তখনও পরিষ্কার হয়নি। সকাল থেকে মেঘ ঘনিয়ে আবারও বৃষ্টি। সকাল সাড়ে সাতটায় অন্য একটা ভাড়া করা গাড়ি কবিদের শিলং নিয়ে যাবে এইরকম মোটামুটি ঠিক আছে। তথাপি রথীন্দ্রনাথ গাড়ির ব্যাপারটা সুনিশ্চিত করতে বেরিয়ে গেলেন। কারণ সে-গাড়ি যদি অন্য কেউ ইতিমধ্যে ভাড়া করে নেয় তো সমূহ বিপদ। যাই হোক, কিছুটা বুঝি ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে— পৌনে আটটা নাগাদ গাড়িও এল আর বৃষ্টিও থামল। গাড়িতে কেবল আরোহীরাই উঠলেন ; বিপুল লাগেজপত্র আগের দিনই সাধুচরণ অন্য একটি মালবাহী মোটরগাড়িতে তুলে নিয়েছিল। বৃষ্টিবিরত সকালে মোটরকোম্পানির গাড়ি কবিদের নিয়ে শিলং পাহাড়ের পথে দ্রুত ছুটে চলল। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই দেখা গেল গত কালকের মালবাহী মোটরগাড়িটি ভগ্ন অবস্থায় পথের পাশে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। যাবতীয় সব মালপত্র তারই মধ্যে, সাধুচরণ কোনওক্রমে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়িতে উঠে গন্তব্যে পৌঁছেছে। মালপত্র শীতবস্ত্রাদি

~ journeybybook.com ~

রইল আপাতত স্তব্ধ গাড়িটায় ; তাকে পাশ কাটিয়ে কবিদের গাড়ি পাহাড়ের বাঁক ঘুরে ঘুরে দৃশ্যপট পালটাতে পালটাতে শিলং শহরে এসে পৌঁছল। শিলং-এ আসার যাত্রাপথে এমন দুর্যোগ-দুর্বিপাকের মধ্যে শুধু সান্ত্বনার কথা এই যে শিলং পাহাড়টা যেখানে দাঁড়ানর কথা ছিল সেখানেই ঠিকটি দাঁড়িয়ে আছে। পাইন দেবদারুর বনানী শিলং পাহাড়ের উঁচুনিচু মনোরম সৌন্দর্য কবিকে সাদরে বরণ করে নিল। শিলং-এ পৌঁছেই কবির সেই শৈলাবাসটি ভালো লাগল। মুহূর্তে শিলং হয়ে উঠল কবির একান্ত প্রিয় একান্ত আপনার।

'ব্রুকসাইড' নামাঙ্কিত একটি বাড়িতে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথ। ১১ অক্টোবর পৌঁছেই ১২ অক্টোবর শিলং-এ পৌঁছানর বিস্তারিত সংবাদ জানিয়ে কবি দীর্ঘ পত্র লেখেন রাণুকে।

সেই চিঠির সূত্রেই কবির প্রথম শিলং-এ আসার বিবরণ আমরা বিবৃত করেছি।

শিলং-এ আসার দু'বছর আগে ১৯১৭-র ১৯ আগস্ট থেকে রবীন্দ্রনাথ রাণুকে চিঠি লিখতে শুরু করেন। শিলং থেকে পাঠানো এই চিঠি রাণুকে লেখা এটি কবির বাষট্টি সংখ্যক পত্র।

আজকে বারো বছর বয়সের যেসব ছেলেমানুষ মেয়েকে বালিকা বলি, একশো বছর আগে সেই বয়সের মেয়েরা রীতিমতো বিবাহাদি করে পতিসেবা করেছে এবং সন্তানের জন্ম দিয়ে সংসারধর্ম পালন করেছে। রবীন্দ্রনাথ বাইশ বছর বয়সে দশ বছরের মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন এবং স্ত্রীর বারো বছর বয়সেই কবির প্রথম সন্তানটি জন্মায়। একথা ঠিক, কোনও বালিকার সঙ্গে দাম্পত্য জীবনযাপনে 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর কবির কোনও অসুবিধা হয়নি। কোনও বালিকার সঙ্গে বন্ধুত্বে বা প্রণয়ে বারো বত্রিশ বা বিয়াল্লিশের ব্যবধান বড় কথা নয়। রাণুর সঙ্গে কবির যখন প্রথম পত্রমিতালি হয় তখন রাণুর বয়স মৃণালিনীর প্রায় বিয়ের বয়সের মতোই ছিল। বরং কবিপত্নীর সেই

~ journeybybook.com ~

বয়সের চেয়ে একটু বেশিই। রাণুর তখন বয়স ছিল এগারো। পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও সেই রাণুর সঙ্গেই সখ্যতা স্থাপন সম্ভব যে-রাণু তার সেই সামান্য এগারো বছর বয়সেই তার অসামান্য রবীন্দ্রানুরাগে কবিকে গভীরভাবে অভিভূত করেছিল। কোন্ রাণুকে কবি ভালোবেসেছিলেন? সেই রাণুকে, এগারো বছর বয়সের সেই পরিণত বালিকাটিকে, কবিকে যে-মেয়ে তার প্রথম চিঠিতে লিখেছিল— 'প্রিয় রবিবাবু, আমি আপনার গল্পগুচ্ছের সব গল্পগুলো পড়েছি, আর বুঝতে পেরেছি। কেবল ক্ষুধিত পাষাণটা বুঝতে পারিনি।...আচ্ছা জয়পরাজয় গল্পটার শেষে শেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল। না? কিন্তু আমার দিদিরা বলে শেখর মরে গেল। আপনি লিখে দেবেন যে, শেখর বেঁচে গেল আর রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হল। কেমন? সত্যিই যদি শেখর মরে গিয়ে থাকে, তবে আমার বড় দুঃখ হবে। আমার সব গল্পগুলোর মধ্যে মাস্টারমশায় গল্পটা ভালো লাগে। আমি আপনার গোরা, নৌকাডুবি, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, রাজর্ষি, বৌঠাকুরাণীর হাট, গল্পসপ্তক সব পড়েছি। কোনও কোনও জায়গায় বুঝতে পারিনি কিন্তু খুব ভালো লাগে। আপনার কথা ও ছুটির পড়া থেকে আমি আর আমার ছোটো বোন কবিতা মুখস্থ করি। চতুরঙ্গ, ফাল্গুনী ও শান্তিনিকেতন শুরু করেছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না। ডাকঘর, অচলায়তন, রাজা, শারদোৎসব এসবও পড়েছি। আমার আপনাকে দেখতে খু-উ-উ-উ-উ-উ-উব ইচ্ছে করে।'— এই সেই রাণু, এই চিঠি থেকেই শুরু হয়েছিল রাণু-রবীন্দ্রের দুর্লভ মিতালি।

ব্রতকসাইড থেকে প্রথম চিঠিটি লিখেছিলেন এই রাণুকেই। সেটা ১৯১৯ সাল, রাণুর বয়স তখন তেরো। ১৯২৩-এ কবি আবার এলেন শিলং-এ। এবার জিৎভূমিতে। সঙ্গে এবার রাণু স্বয়ং। তখন সে

~ journeybybook.com ~

পূর্ণ যুবতী, বয়স সতেরো। সুন্দরী তন্বী লাবণ্যে ভরা। শিলং-এর পাহাড়ি পথে রাণু ও রবীন্দ্রনাথ হাঁটছেন। শেষের কবিতা তখনও লেখা হয়নি। আমাদের মনে পড়ে যায় শেষের কবিতার একটা বর্ণনা। 'কিছু দূরে যেতে যেতে দুজনের হাত মিলে গেল, ওরা কাছে কাছে এল ঘেঁষে। নির্জন পথের ধারে নিচের দিকে চলেছে ঘন বন। সেই বনের একটা জায়গায় পড়েছে ফাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দি থেকে একটুখানি ছুটি পেয়েছে ; তার অঞ্জলি ভরিয়ে নিয়েছে অস্তসূর্যের শেষ আভায়। সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়াল। অমিত লাবণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরলে। লাবণ্যর চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর

~ journeybybook.com ~

নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে, যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্ত্যজগতের অব্যক্ত ধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে। অমিতর বুকের কাছ থেকে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, চলো এবার। কেমন তার মনে হল, এইখানে শেষ করা ভালো। অমিত সেটা বুঝলে, কিছু বললে না। লাবণ্যর মুখ বুকের উপর একবার চেপে ধরে ফেরবার পথে খুব ধীরে ধীরে চলল।'

এই ভ্রমণ ১৯২৮-এ লেখা শেষের কবিতার শিলং পাহাড়ে অমিত ও লাবণ্যর ভ্রমণ। আর ১৯২৩-এ শিলং পাহাড়ে রাণুকে সঙ্গে নিয়ে কবির প্রতিদিনের বেড়ানর দৃশ্যটিও সেদিন শিলং-এর বাঙালি সমাজেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে সেদিনের এক প্রত্যক্ষদর্শী মুদ্রাক্ষরে লিখে গেছেন, 'জিৎভূমিতে থাকতেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ফণী অধিকারীর ছোট একটি মেয়ে তখন ছিল শিলং-এ। তার সঙ্গে বেড়াতেন ; হাসি-মস্করা, গল্প-গুজব করতেন। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের সঙ্গে পনেরো বছরের বালিকার একত্রে ভ্রমণের দৃশ্যটি উপভোগ্য হত।' পরবর্তী কালে লেখা প্রত্যক্ষদর্শীর এই বিবরণীতে মেয়েটির বয়স দু'বছর কমান হয়েছে আর কবির বয়স আট বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথায় বাষট্টি কোথায় সত্তর, ভুল না ইচ্ছাকৃত জানি না। একথা ঠিক রাণুর সঙ্গে রবির একটি গভীর আবেগের সম্পর্ক ছিলই। অমিতর সঙ্গে রবি ঠাকুরের যেমন বিরোধও ছিল তেমনি ভিতরে ভিতরে মিলও ছিল অনেক।

মিলটা যাতে সতর্ক পাঠকের চোখে তেমন ধরা না পড়ে তাই ঔপন্যাসিক যথেষ্ট তৎপর ছিলেন অমিতকুমার রায় তথা নিবারণ চক্রবর্তী ও রবি ঠাকুর তথা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দূরত্ব ও বিরোধ সৃষ্টি করায়। কেন অমিত রে-র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই খুঁজে পাচ্ছি সেকথা পরে ব্যাখ্যা করব। তার আগে লাবণ্য-রাণুর মিলের কথাটা বলি। আপাতমস্তক

~ journeybybook.com ~

রবীন্দ্র-অনুরাগে সিক্ত শেষের কবিতার নায়িকা লাবণ্যলতার মতোই শিলং পাহাড়ে বেড়াতে আসা কবির দীর্ঘ দেড় মাসের ভ্রমণসঙ্গিনী সপ্তদশী রাণু ; পাঁচ বছর পরে শেষের কবিতা রচনা কালে রাণুর বয়স হয়েছিল বাইশ। উপন্যাসে লাবণ্যর চেহারার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে রাণুর খুব মিল বেশ লক্ষ করা যায়। আগেই বলেছি উপন্যাস রচনাকালে রাণুর বয়স বাইশ। সেই রাণুর ছবি প্রতিফলিত হয়েছে লাবণ্যর রূপবর্ণনায়। আমার সৌভাগ্য, আমার যখন আট বছর বয়স, সেই সময় ১৯৫০ সালে আমি রবীন্দ্রনাথের সেই রাণুকে দেখেছিলাম, তাঁর রাঁচির বাড়িতে, তখন তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ। আমরা তখন পুজোর ছুটিতে রাঁচিতে বেড়াতে গেছি। চেঞ্জে। একদিন লেডি রাণু মুখার্জি ওঁদের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য আমার পিতৃদেব অধ্যাপক বিজনবিহারীকে আমন্ত্রণ জানান। মনে আছে বাবার সঙ্গে তাঁর বন্ধুর বাড়িতে সেদিন আমিও গিয়েছিলাম। বাবাদের আড্ডায় আর-একজনও ছিলেন, তিনি আনন্দবাজারের কানাইলাল সরকার। বিজনবিহারী ও রাণু উভয়েই একবয়সি, ১৯০৬-এ জন্ম। আমি ওঁদের বিশাল বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। বয়স আট হলে কী হবে লেডি রাণুর সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়েছিলাম। পরে শেষের কবিতায় লাবণ্যর রূপবর্ণনা পড়তে পড়তে মনে হয় এ মহিলা যেন আমার চোখে দেখা। 'মেয়েটির পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কবজি পর্যন্ত, দু-হাতে দুটি সরু প্লেন বালা।...' লাবণ্য-অমিতর পরস্পরের ভালোলাগা ভালোবাসা প্রেম বিবাহের সম্ভাবনা এবং শেষ পর্যন্ত তা ফলপ্রসূ না হওয়া— এই সব নিয়ে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের যে টানাপোড়েন ঘটে

~ journeybybook.com ~

তা কি শিলং থেকে ফেরার পর রাণু ও রবীন্দ্রের সম্পর্কের যে সংকট তারই কোনও সূক্ষ্ম প্রতিফলন নয়? রাণু-রবীন্দ্রের চিঠিপত্রে আর অমিত-লাবণ্যের সংলাপে বদ্ধ-প্রেম ও মুক্ত-প্রেমের যে তত্ত্বটা প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যেও কি অনেকখানি মিল নেই?

১৯১৯-এ রবীন্দ্রনাথ যখন শিলং-এ এসে তাঁর তেরো বছরের রাণুকে একটির পর একটি চিঠি লিখছেন ব্রুকসাইড বাড়িতে বসে, তখন ওই শিলং-এই একটি এগারো বছরের মেয়ে কবিসন্দর্শনে কতখানি কৌতূহলী ও উৎসাহী একটু দেখা যেতে পারে। সেই বালিকা পরবর্তী কালে আমাদের সকলের প্রিয় লেখিকা লীলা মজুমদার। 'আর কোনোখানে' বইতে শিলং-এর সেই বাল্যকালের স্মৃতিচারণ তাঁর : 'একদিন মাসীমা বললেন— ওরে বলতে ভুলে গেছি, কলকাতায় শুনে এসেছি, রবীন্দ্রনাথ এখানে বেড়াতে আসছেন, তারজন্য ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বাড়ি নেওয়া হয়েছে। শুনে মার মুখে কথা সরে না, ওঁরা সবাই রবীন্দ্রনাথের বড় ভক্ত ; জোড়াসাঁকোতে সুকিয়া স্ট্রিটে যাওয়া-আসা ছিল, জোড়াসাঁকোর কোনো উৎসব জ্যাঠামশাই গিয়ে বেহালায় ছড়ি না লাগালে সম্পূর্ণ হত না। মার বইয়ের তাকে রবীন্দ্রনাথের কত বই। একবার খেয়া বলে একটা দুর্বোধ্য বই থেকে মাত্র একটা পাতা ছিঁড়ে তেঁতুলের আচার মুড়েছিলুম বলে আমার লাঞ্ছনার শেষ ছিল না। সেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের শহরে আসছেন।...সেই রবীন্দ্রনাথকে এতকাল বাদে হাতের কাছে পাচ্ছি, আমাদের উৎসাহও কিছু কম ছিল না। বনভূমির মাঝখানে ছোট্ট নদী, ঝোপে-ঝাপে ঢাকা, আছে কি নেই বোঝা যায় না। অল্প একটু স্রোত, তার কল্লোল নেই, চারিধারে সৌখিন বাড়ি। বাড়ির নাম ব্রুকসাইড, সেখানে রবীন্দ্রনাথ এলেন। সালটা ১৩২৬। গিয়ে দেখি ঝোলা-ঝোলা লম্বা পোষাক, রাজারাজড়াদের মতো, পায়ে নক্‌শাকরা নাকতোলা চটি, লম্বা কোঁকড়া চুলদাড়ি। ফর্সা রঙ। বারবার চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে, আবার লজ্জাও করে। তাঁদের বাড়িতে একদিন চা-পার্টি হল।

~ journeybybook.com ~

তখনকার দিনে বড়লোকেরা গার্ডেন পার্টি দিতেন। বাগানে বসে স্যান্ডুইচ, প্যাটিস, কেক, বরফি ইত্যাদি উপাদেয় দ্রব্যাদি খাওয়া হত, গান হত, নানারকম খেলা হত। রবীন্দ্রনাথ সেদিন কবিতা পড়েছিলেন— কেষ্টা বেটাই চোর ছাড়া কিছুই মনে পড়ে না।'

লীলা ও রাণুর বয়সের ব্যবধান মাত্র দুই। এঁদের একজন ঠাকুরবাড়ির অন্তরঙ্গ হয়েও 'রবীন্দ্রনাথ'-এর সঙ্গে প্রায় অপরিচিত ;অন্যজন লীলার বয়সেই 'রবীন্দ্রনাথ' সবই প্রায় পড়া এবং এখন তো সে রীতিমতো কবির প্রিয় বান্ধবীই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বয়সটা গণনীয় নয়, কে কোথায় দাঁড়িয়ে সেটাই দেখতে হবে।

১৯১৯-এর অক্টোবরের ১১ থেকে ৩১-এর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই প্রায় টানা তিনটি সপ্তাহ শরতের শৈলশহর শিলং-এ কবি অবকাশযাপন করলেন।

এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঢেউ খেলান পর্বতশিখর, পাহাড়বেষ্টন করে নিচ থেকে ওপরে উঠে যাওয়া সরু সরু পথ, কলস্বরে মুখরিত ছোট নির্ঝরিণী, আকাশচুম্বি পাইন গাছের সারি, শান্তনির্জনতা, অবাঞ্ছিত বৃষ্টির অনুপস্থিতি, আরামের শীত— সব মিলিয়ে খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল কবির সেবারের সেই শিলংযাপন। দার্জিলিং-এ কতবার গেছেন ; শিলং-এ এবার প্রথম। প্রথম পরিচয়েই শিলংকে ভালো লেগেছে কবির ; এমনকি দার্জিলিং-এর চেয়েও। যে ব্রুকসাইড বাড়িতে আছেন তার চত্বরটিও বড় সুন্দর। সাজান বাগান। বাগানে ফুলগাছের চান্‌কায় কত রংবেরঙের ফুল— চামেলি চন্দ্রমল্লিকা গোলাপ। আরও কত নাম-না-জানা ফুল।

সকাল থেকে সন্ধে সারাদিন শৈলশহরে কেমনভাবে কাটত কবির?

ভোরবেলায় ওঠা বরাবরের অভ্যাস। এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। ভোরবেলায় ফোটাফুলের মাঝখান দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করে বেড়ান ওঁর ছিল সকালের প্রথম কাজ।

~ journeybybook.com ~

শীতটা ক্রমেই একটু একটু করে বাড়ছে। স্নানের সময়টা ছাড়া বাদবাকিটা ভালোই কাটে। ইচ্ছে করে না ঠাণ্ডায় স্নানঘরে ঢুকতে ; কিন্তু সেই অনিচ্ছাকে প্রশ্রয় দিতে রাজি নন কবি। সাধুচরণকে যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গেই বলতে হবে— 'সাধু, আমার নাবার জল ঠিক করে দে।' স্নান সেরে বেরিয়ে এসে উৎকলবাসী তুলসী পাচকের স্বহস্তে প্রস্তুত পাক গ্রহণ। আহারান্তে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় হয় চিঠি লেখালেখিতে। যাঁদের চিঠি লিখছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম নামটি রাণু। ঘরে চলছে চিঠি লেখার পর্ব, বাইরে তখন নীল আকাশে সাদা মেঘেদের গা এলিয়ে রোদপোহানর পালা। ওই মেঘেদের মতো এই শরতের পড়ন্ত মধ্যাহ্নে আরামকেদারায় আলসভরে সময় কাটাতে পারলে ভালোই লাগত ; কিন্তু অবসরযাপনে এসেও বিশ্রামের বুঝি কোনও সময় নেই কবির।

চিঠি লেখা, নিজের প্রবন্ধের কিছু ইংরেজি তর্জমা করা, বিদেশে যাবার আমন্ত্রণ থাকায় ইংরেজিতে কিছু কিছু বক্তৃতা তৈরি করা, প্রতিদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা অনেক লোকের সঙ্গে কথা বলতেই সারাদিনের অনেকটা সময়ই কেটে যায় কবির। কাউকে নিরাশ করতেন না দেখা না করে।

ব্রাহ্মসমাজে একটা বক্তৃতাও দিতে হয়। ঢেঁকি যেখানেই যায় ধান ভানে। কাউকে না করতে পারেন না কবি। এক প্রাক্তন ছাত্রকে পত্রে লিখছেন (১৮ অক্টোবর), 'লোকের ভিড় চলছে। কাল ব্রাহ্মসমাজে এখানকার ব্রাহ্মদের সঙ্গে আলোচনা করবার কথা আছে।' আর সেই বক্তৃতা শোনার স্মৃতি স্মরণ করে একজন লিখেছেন, 'সেবার আর একদিন মাত্র দেখেছিলুম, পুলিশ-বাজারের ব্রাহ্মসমাজে। কবি সেখানে বক্তৃতা করেছিলেন।'

শিলং থেকে গৌহাটী, সিলেট, আগরতলা ঘুরে কবি কলকাতায় ফেরেন ১২ নভেম্বর। ১৩ তারিখে আসেন শান্তিনিকেতনে। আর ১৪ তারিখেই শান্তিনিকেতন থেকে রাণুকে লেখেন, 'কল্যাণীয়াসু রাণু

~ journeybybook.com ~

অনেক ঘুরে ফিরে কাল এখানে এসেছি। এতদিনকার চিঠি জমে পর্বত সমান হয়ে উঠেচে। কত কালে সব জবাব সারা হবে জানিনে। এরই মধ্যে ফস্ করে তোমাকে দু-চার লাইন লিখে দিচ্চি। শিলং-এ থাকতেই তোমার জন্যে সেখানকার তৈরি একটা বস্ত্রখণ্ড কিনেছিলুম— পাঠাবার সুবিধা না হওয়াতে এতদিন পড়েছিল। এইবার এখান থেকে পাঠাচ্চি।'

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী শিলংযাত্রা প্রথম শিলং ভ্রমণের সাড়ে তিন বছর পর— ১৯২৩-এর এপ্রিলের শেষে।

১৯১৯-এ রাণু ছিলেন মনের মধ্যে, ১৯২৩-এ শিলংভ্রমণে কবির সঙ্গী সেই সুন্দরী রাণু এবার স্বয়ং। রাণুকে সঙ্গে নিয়ে এটাই কবির প্রথম দূর ভ্রমণ। গন্তব্য শিলং পাহাড়, যা কবির কাছে 'দার্জিলিং-এর চেয়ে অনেক ভালো।'

এবারের গ্রীষ্মে শান্তিনিকেতনে গরমের তাপ খুব বেশি। আশ্রমে ২৬ এপ্রিল থেকে গ্রীষ্মাবকাশ শুরু। তার ক'দিন আগেই কবিরা শিলং যাত্রার উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় এসে পৌঁছান। এবারে কবির দলের সঙ্গে আছেন পুত্র ও পুত্রবধূ, পালিতা পৌত্রী পুপে, কন্যা মীরা, দৌহিত্রী নন্দিতা এবং গ্রেচেন গ্রিন ; আর আছেন সপ্তদশী সুন্দরী রাণু অধিকারী।

প্রথমে গ্রেচেন গ্রিনের পরিচয়টা সংক্ষেপে দিয়ে নিই, পরে যে কৌতূহল আমাদের সেই প্রশ্নে আসব কেন কবির এই সফরে বেনারসবাসিনী সপ্তদশী সুন্দরী।

আমেরিকার মিস গ্রেচেন গ্রিন ১৯২২ সালের শেষ দিকে সেবার ব্রত নিয়ে শ্রীনিকেতনের কাজে যোগ দেন। এঁকে আশ্রমের কর্মযজ্ঞে পাবার পর কবি একদিন বলেন, 'আমরা আমেরিকার একটি মহিলাকে সহায়রূপে পেয়েছি। তিনি ডাক্তার নন, যুদ্ধের সময় রোগীর শুশ্রূষা করাতে কতকটা পরিমাণে হাতে-কলমে জ্ঞান হয়েছে, সেইটাকে মাত্র নিয়ে তিনি রোগীদের ঘরে এক-হাঁটু কাদা ভেঙে গিয়েছেন।...অসহ্য

~ journeybybook.com ~

গরমে শরীরে গ্লানি সত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য কর্মও তিনি ছাড়েননি।' এই গ্রেচেন গ্রিন ১৯২৪ মার্চ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তারপরে কবির দলের সঙ্গে চীন পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে আমেরিকায় চলে যান।

এখন সেই প্রশ্নে ফিরে আসা যাক ; কবির শিলং সফরের সঙ্গীদলে হঠাৎ বেনারসবাসিনী সপ্তদশী রাণু কেন?

গ্রীষ্মের ছুটিতে সপরিবার রবীন্দ্রনাথের দেরাদুন যাবার কথা। শান্তিনিকেতন থেকে বেরবার দুদিন আগে হঠাৎ কোনও সংবাদ না জানিয়ে দিদিকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে রাণু এসে উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ সেইদিনই রাণুর বাবাকে চিঠিতে লিখলেন, 'আজ সকালে ডেস্কে বসে একটা নূতন গান নিয়ে তার উপর সুর চড়াচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার চৌকির পিছনে রাণুর আবির্ভাব। জিজ্ঞাসা করলাম— বাড়ি থেকে পালিয়ে আসনি তো। সে বললে— পালিয়ে এসেছি। কিন্তু সম্মতি নিয়ে এবং সঙ্গিনী সহযোগে। অতএব পুলিশে খবর দেবার দরকার হবে না। ওকে দেখে খুশি হলুম। কিন্তু ওকে আশার [রাণুর দিদি] সঙ্গে কাশীতে ফিরিয়ে দেব না। আমরা দেরাদুন যাচ্ছি। সেখানে ওকে নিয়ে যাব। বলাবাহুল্য ওর নিজের তাতে অসম্মতি নেই, আমার প্রতি ওর জন্মজন্মান্তরের দাবি আছে।'

শেষ পর্যন্ত দেরাদুনের পরিবর্তে শিলং শৈলাবাসে যাওয়া স্থির হয়। রবীন্দ্রনাথের দাদা হেমেন্দ্রনাথের জামাতা ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'জিৎভূমি' বাড়িটি দুশো টাকায় ভাড়া পাওয়া গেলে সেখানে যাওয়াই সিদ্ধান্ত হয়।

রাণু এবং অন্যান্যদের নিয়ে এবারে কবির শিলংবাস প্রায় চল্লিশ দিনের। জিৎভূমি বাড়িটি বেশ বড়, সুন্দর দেখতে, একতলা বাড়ি, ঘরের মেঝে মাটি থেকে বেশ উঁচু, বাড়ির সামনের দিকে লম্বা ঢালা বারান্দা, ক'খান চেয়ার পেতে রোদে পা মেলে আড্ডা দেবার পক্ষে মনোরম আঙিনা।

বাড়ির ভেতরে ঘরও বেশ কয়েকটি। তা শুত কে কোথায়? আমরা

~ journeybybook.com ~

মধ্যবিত্ত মানুষ ; আমাদের তো কৌতূহল ওই খাওয়ায় আর শোওয়ায়। যাই হোক সে-সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে— রবীন্দ্রনাথ বা অন্যেরা কে কোথায় শুতেন, এবং কবির ঘরে আর কারও শয্যা ছিল কি না। প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাচ্ছে কবি তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে একাই থাকতেন। কবিকন্যা মীরা কবির পাশের ঘরেই থাকতেন, আর সেই ঘরেই রাণুর থাকার ব্যবস্থা ছিল। মীরার উলটোদিকের ঘরে প্রতিমা দেবী থাকতেন ছোট্ট পুপেকে নিয়ে। পার্শ্ববর্তী অন্য একটি কুঠিতে মিস্ গ্রিনের থাকার ব্যবস্থা। প্রায় প্রতিদিনই প্রতিমা দেবী সব মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরতেন। তবে রাণু অনেক সময়েই সেই দলে থাকত না ; কবির সান্নিধ্য ছিল তার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। কবি বেড়াতে বেরলে রাণু অনেক সময়েই কবির সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। রাণুর সঙ্গ কবিরও ভীষণ ভালো লাগত। রাণুকে লেখা চিঠিতে বারবার সেই পঞ্চদশী > ষোড়শী > সপ্তদশীর যে সঙ্গকামনা করেছেন তা কি মিথ্যা, তা কি শুধু চিঠির ভাষাতেই সত্য? চিঠির রবীন্দ্রনাথ ও বাস্তবের রবীন্দ্রনাথ কি আলাদা? সত্যিই কি রাণুর এমন অন্তরঙ্গ কাছে কাছে থাকাটা, এই প্রীতিসান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথকে মনে-প্রাণে-অন্তরে আমোদিত-পুলকিত করে না? পাইন বৃক্ষের ছায়াঘন আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে অনর্গল কথা বলতে বলতে রাণুকে সঙ্গে নিয়ে হাসিখুশি রবীন্দ্রনাথের পদচারণা শিলং-এর অনেক বাঙালিই সেদিন 'উপভোগ' করেছিলেন। তখন যদি 'শেষের কবিতা' লেখা হয়ে যেত তাহলে এই উপন্যাসের শিলংবাসী পাঠকেরা দূর থেকে ভাবত বুঝি বা পাহাড়ের কিনারায় অমিত-লাবণ্য গল্প করতে করতে চলেছে। কিন্তু তখনও শেষের কবিতা লেখা হয়নি এবং সেই উপন্যাস জন্ম নেবার মতো কোনও অবস্থাও তখনও জগৎসংসারে ঘটেনি। একটা গল্প বা একটা উপন্যাস বা নাটক রচনার পিছনে লেখকের জীবনের কোনও না কোনও অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই থাকে। নির্মিত সব উপাখ্যান রচনার পিছনে লেখকের জীবনের কোন্

~ journeybybook.com ~

অভিজ্ঞতা কীভাবে কাজ করেছে তা কি পাঠক সবটুকু জানতে পারে? কখনও কখনও লেখক তার আভাস-ইঙ্গিত দেন আবার কখনও কখনও কৌতূহলী পাঠককেই আবিষ্কার করে নিতে হয়। ফুলে ছাওয়া পাখি-ডাকা শিলং পাহাড়ের পথে এই যে রাণু-রবীন্দ্রের পদচারণা, তা যে পাঁচটি বছর যেতে না যেতেই কবির লেখা উপন্যাসে ফুলে ছাওয়া পাখি-ডাকা শিলং পাহাড়ে লাবণ্য-অমিতর নিবিড় সান্ধ্যভ্রমণে রূপান্তরিত হবে তা কি কেউ সেদিন ভাবতে পেরেছিল? শেষের কবিতা ১৯২৯-এ বেরিয়ে যাবার পর সেদিন কোনও কোনও শিলংবাসীর এই উপন্যাস পড়ে পাঁচ বছর আগের রাণু-রবীন্দ্রের ছবিটা মনে পড়লেও পড়তে পারে। কিন্তু উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা আর রাণু-রবীন্দ্রের মধ্যে মিল কি শুধু শিলং পাহাড়ে ওই দুই জোড়া নারী-পুরুষের প্রীতিপূর্ণ পদচারণার মধ্যেই। নাকি আরও আছে?

আগে তো রবীন্দ্রনাথ শেষের কবিতা লিখুন, তারপরে ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান করা যাবে। আবারও জানিয়ে রাখি ১৯২৮-এ শেষের কবিতা লেখার আগে আরও একবার কবি শিলং এসেছিলেন। সেটা ১৯২৭ সাল। সেবারেও শিলং-এ পৌঁছেই রাণুকে পৌঁছ-সংবাদ দেন কবি। ১৯১৯ আর ১৯২৭ ; একই ব্যক্তি একই স্থান থেকে একই ব্যক্তিকে পৌঁছ-সংবাদ দিচ্ছেন— কিন্তু দুটি চিঠির ভাবে ভাষায় আবেগে আকারে আয়তনে উপস্থাপনে আকাশ-পাতাল তফাৎ। চিঠি লিখছেন শৈলশহর শিলং থেকে, চিঠির লেখক রবীন্দ্রনাথ, চিঠির প্রাপক রাণু ;১৯১৯-এ মিস্ রাণু অধিকারী আর ১৯২৭-এ মিসেস রাণু মুখোপাধ্যায়। রাণু এসময় বিবাহিত, স্বামী বীরেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। চিঠির প্রথম ছত্রেই কবি রাণুকে লিখছেন, 'শিলঙে এসে পৌঁচেছি। কিন্তু এ আর এক শিলং।' সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু পালটে যায়। পালটে যায় শুধু শিলং শৈলশহরটা নয়, পালটে যায় অবস্থার টানাপোড়েনে মানুষও এবং মানুষের মন।

~ journeybybook.com ~

একদিন যে প্রেম যে আবেগ থাকে, সময়ের নদী পেরিয়ে আর-একদিন তা হয়ত থাকে না, হয়ত অনেকটা হারিয়ে যায়, হয়ত বা কিছুটা থাকে। একদিন যে প্রেমের তরী বাতাসের অনুকূলতায় পাল তুলে ছুটেছিল, আর-একদিন সে বাতাস ঘুরে যায়, পালে আর হাওয়া লাগে না, নৌকা আর এগোয় না। প্রেমের জোয়ারে ভাসতে ভাসতেও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বিবেচনা ও অবিবেচনাবোধ কাজ করে। প্রতাপ শৈবলিনী পরস্পরকে ভালোবাসত। সে প্রেমের যে কোনো দিশা নেই শৈবলিনী তা জানত না, প্রতাপ জানত। তাই একদিন প্রতাপ সেই সার্থকতাশূন্য প্রেমের নৌকায় না ভেসে ডুবতে চেয়েছিল। তেরো থেকে সতেরো— এই সুদীর্ঘ

~ journeybybook.com ~

চার বছর পারস্পরিক অজস্র অজস্র পত্রবিনিময়ে, এবং এই দীর্ঘ চার বছর রাণুর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অফুরান অপর্যাপ্ত উদ্বেলিত স্নেহ প্রীতি ভালোবাসায় এবং কবির অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য সাহচর্যে রাণুর পক্ষে বুঝে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি যে এ তার প্রতি কবির নিঃসংশয় গভীর অনুরাগ। চিঠিতে রাণুর প্রেরিত অজস্র চুম্বন উপহার সত্ত্বেও সে-অনুরাগ সে-প্রেম আদৌ শরীরকে স্পর্শ করেছিল কি না তা আমাদের জানা নেই ; তবে প্রশ্ন হল, শরীরকে স্পর্শ না করলেই কী সে প্রেম নিষ্কলুষ, আর একটু ছোঁয়া লাগলেই কলুষ! যতই তোমার প্রেমে একটি মেয়ে দিশাহারা হয়ে অথৈ জলে ভাসুক, তুমি তার শরীর স্পর্শ না করলে, বা তার শরীর স্পর্শ করার মতো কোনও রকম প্রমাণ যদি তুমি রেখে না যাও তবে সমাজ তোমাকে সাধুবাদ দেবে। তোমার এই আবেগসর্বস্ব দীর্ঘকালের প্রীতি-ভালোবাসা-সখ্যতাকে দেহাতীত প্রেম বলে তোমাকে প্রশংসা করবে তারিফ করবে সবাই এবং সদাই।

যাই হোক, শিলং-এ মাসদেড়েক জিৎভূমিতে কাটিয়ে এবং পরস্পর প্রতিদিন উভয়ের নিকট সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাবার ফলে উভয়ের প্রীতি-ভালোবাসার সম্পর্কটা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে। শিলং-পরবর্তী উভয়ের চিঠির ভাষা অবশ্যই তার প্রমাণ দেবে।

জীবনে শোক অথবা প্রেম— কোনওটাকেই কবি তাঁর কর্তব্যকর্মের উপরে স্থান দেননি। শোক এবং প্রেম উভয়কেই তিনি তাঁর সংকল্পিত কর্মের প্রেরণারূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাই কবির জীবনে তাঁর শোক তাঁর প্রেম কখনও ব্যর্থ হয়নি। শেষের কবিতার লাবণ্য তো পরের কথা, শিলং-এ বসেই যে-নন্দিনীচরিত্র সৃষ্টিতে কবি হাত দিলেন রক্তকরবী নাটকে, সে কি প্রেমোদ্বেলিত রাণুকে চোখের সামনে দেখতে দেখতে নয়? হতে পারে ; নাও হতে পারে।

যাই হোক, রক্তকরবীর মতো নাটক লেখা শুরু করলেন শিলং-এর জিৎভূমিতে বসে। লেখা শুরুর আগেই ১১ মে অমিয় চক্রবর্তীকে একটি

~ journeybybook.com ~

চিঠিতে কবি লিখছেন, 'একটা নাটক গোচের একটা কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে।' একটা লেখার জন্যে প্রেরণা বা তাগিদ নানা দিক থেকে আসতে থাকে। শিলং-এ সেই সময় ছিলেন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম-এ, এবং পরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার। সেই সময় তাঁর বয়স তেত্রিশ। সারা জীবনে ইংরেজি বাংলা অনেক বই লিখেছেন। পণ্ডিত মানুষ। কবির শিলংবাসকালে তিনিও শিলং-এ ছিলেন। প্রায়ই উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা হত। রাধাকমল অল্প কিছুকাল আগে বোম্বাইয়ের শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন— সেইসব কথা তিনি কবিকে গল্পচ্ছলে বলতেন। আর কবি ভিতরে-ভিতরে সেই গল্পের মধ্য থেকে তাঁর নতুন নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করতেন।

এই গ্রীষ্মে শিলং-এ আরও দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ঘটেছিল— তাঁদের একজন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন, অন্যজন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। এই দুজনই কি রক্তকরবী নাটকে যথাক্রমে পুরাণবাগীশ ও চিকিৎসক চরিত্ররূপে আবির্ভূত। রবীন্দ্রনাথ একটির পর একটি পাণ্ডুলিপিতে রক্তকরবীর সংশোধনকর্ম সম্পাদন করতে থাকেন। এই নাটকের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা দশ। তার মধ্যে দু-তিনটি খসড়া শিলং-এই লিখে ফেলেন। শিলং-এর দোকান থেকে বাঁধান খাতা কিনছেন আর পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন এবং সংশোধনের পর সংশোধন করছেন। শিলং পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসার দিন চারেক আগে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে কবি লেখেন, 'নাটকটা একরকম শেষ হয়েছে। একে নাটক নাম দেওয়া যায় কি না জানি না। কলকাতায় শীঘ্র যাচ্চি তখন শুনতেই পাবে।' শিলং-এও নতুন নাটকের কিছু কিছু অংশ কবি পড়ে শুনিয়েছিলেন। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে শিলংবাসীদেরও কেউ কেউ কবিকণ্ঠে রক্তকরবী পাঠ শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হেম চট্টোপাধ্যায়— তিনি ১৯১৯,'২৩,'২৭

~ journeybybook.com ~

তিনবারই কবিসন্দর্শনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর কলমে ১৯২৩-এর স্মৃতিচারণা : '১৩৩০ সালে [১৯২৩ মে] দ্বিতীয়বার শিলং-এ এসে যখন তিনি জিৎভূমে উঠেছিলেন তখন তাঁকে প্রণাম করার সৌভাগ্য হয়েছিল।...জিৎভূমের যে-বাড়িতে কবি উঠেছিলেন তার মালিক

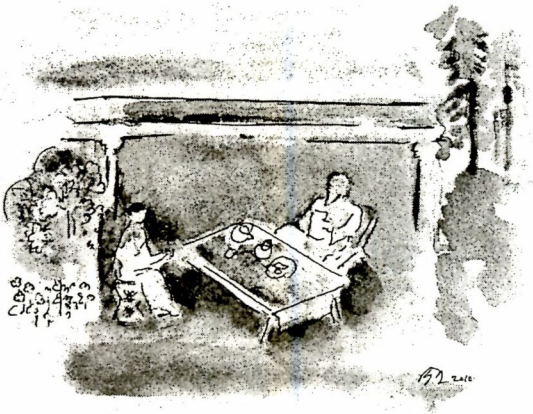

ছিলেন ঠাকুর পরিবারেরই কোনও আত্মীয়। বর্তমানে সে-বাড়ি হস্তান্তরিত হয়েছে। যতদিন গিয়েছি, দেখেছি, বাড়ির সুমুখে উন্মুক্ত আকাশের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি চুপ করে বসে আছেন। কবিগুরুর সেই ধ্যানগম্ভীর অপরূপ রূপ কিন্তু ভুলবার নয়। শান্তিনিকেতনের জনকয়েক প্রাক্তন ছাত্র এবং শিলং-এর দু-চারজন গণ্যমাণ্য ভদ্রলোককে মাঝেমাঝে জিৎভূমের বাংলোয় আনাগোনা করতে দেখতুম। শিলং-এর স্তব্ধ নীরবতা, সুদূরপ্রসারী গিরিশ্রেণি, পাইনবনের শনশন হাওয়া কবির মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। শিলং-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে তিনি অনর্গল কথা বলে যেতেন।

~ journeybybook.com ~

রক্তকরবীর কিছু কিছু লেখা আমাদের পড়ে শোনাতেন। কী যাদু ছিল সেই সুললিত কণ্ঠস্বরে ; কথা শুনতে শুনতে যেন সম্মোহিত হয়ে যেতুম।...মনে আছে একদিন 'তোমারো অসীমে প্রাণ মন লয়ে'— এই গানটি গাওয়া হচ্ছিল ; চেয়ে দেখি গুরুদেবের চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে। আমরা মৌনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। মনে হল, আমাদের এতো কাছে থেকেও তিনি যেন কত দূরে চলে গিয়েছেন। জিৎভূমে যখনই আমরা তাঁর কাছে গিয়েছি তখনই আমাদের সঙ্গে নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে আমাদের কৃতার্থ করেছেন।'

এবারের শিলং বাসকালে কবি পত্রমাধ্যমে দুটি বালিকা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে পত্রকবিতা 'শিলঙের চিঠি' রচনা করেন। শিলংকে ভালোলাগার সবকিছু কবি এই কবিতায় উজাড় করে দেন। শিলং-এ যেই যখন বেড়াতে আসুক না কেন এই কবিতাটি তাকে আগে একবার পড়ে আসতেই হবে। কবিতাটি পরে পূবরী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হয়। শিলং নিয়ে লিখতে বসে ওই কবিতার থেকে দু'ছত্র উদ্ধৃত না করা অসম্ভব। কবিতার শেষে বাঁ দিকে নিচে লেখা 'জিৎভূমি, শিলং /. ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০০'; অর্থাৎ ৯ জুন ১৯২৩। শিলং থেকে এবার কবির ফেরার তারিখ ১৪ জুন। সুতরাং পত্রকবিতাটিতে কবি শিলং-এর যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তা নিঃসংশয়ে বলা যায় সবটুকুই অভিজ্ঞতাজাত সত্যমূলক। এই বর্ণময় ছবিতে যেমন নিসর্গপ্রকৃতি আছে, তেমনি মানুষজনও আছে, আর শিলং-এর পাহাড়কাটা পথে মোটরগাড়ির দৌড়োদৌড়ির প্রসঙ্গও আছে। যে-মোটরগাড়ি পাঁচ বছর পর শিলং পাহাড়ে আবার দেখা গিয়েছিল একটা বড় ভূমিকায় কবির সৃষ্টি শেষের কবিতায়। শিলঙের চিঠি—

গর্মি যখন ছুটল না আর পাখার হাওয়ায় শরবতে,
ঠাণ্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলং নামক পর্বতে।
মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে

~ journeybybook.com ~

ক্লান্ত জনে ডাক দিয়ে কয়, 'কোলে আমার শরণ নে।'
ঝরনা ঝরে কলকলিয়ে আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে,
বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সংগীতে।
বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন বনের পল্লবে,
নিঃশ্বাসে তার বিষ নাশে আর অবল মানুষ বল লভে।
পাথর-কাটা পথ চলেছে বাঁকে বাঁকে পাক দিয়ে,
নতুন নতুন শোভার চমক দেয় দেখা তার ফাঁক দিয়ে।
দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।
চেরাপুঞ্জি কাছেই বটে, নামজাদা তার বৃষ্টিপাত ;
মোদের 'পরে বাদল মেঘের নেই ততদূর দৃষ্টিপাত।
এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়,
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন-পাতার গন্ধ বয় ;
বেশ আছি এই বনে বনে, যখন-তখন ফুল তুলি,
নাম-না-জানা পাখির নাচে, শিস দিয়ে যায় বুলবুলি।
তোমরা দুজন বয়সেতে ছোটোই হবে বোধ করি,
আর আমি তো পরমায়ুর ষাট দিয়েছি শোধ করি
তবু আমার পক্ক কেশের লম্বা দাড়ির সম্ভ্রমে
আমাকে যে ভয় কর নি দুর্বাসা কি যম ভ্রমে,
মোর ঠিকানায় পত্র দিতে হয় নি কলম কম্পিত,
কবিতাতে লিখতে চিঠি হুকুম এল লম্ফিত,
এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হল উৎসাহে,
মনে হল, বৃদ্ধ আমি মন্দ লোকের কুৎসা এ।
মনে হল আজো আছে কম বয়সের রঙ্গিমা
জরার কোপে দাড়ি গোঁপে হয় নি জবড়জঙ্গিমা।
তাই বুঝি সব ছোটো যারা তারা যে কোন্ বিশ্বাসে
এক বয়সী বলে আমায় চিনেছে এক নিঃশ্বাসে।

~ journeybybook.com ~

এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিতরো খুশ আছে,
ডাকছে ভোলা 'খাবার এলো' আমার কি তার হুঁশ আছে?
জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো,
ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।

শিলং-এর বর্ণনা দিতে দিতেই কবিতার মধ্যে দু'টি ছত্রে কবি লেখেন :

বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি,
আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তার সাজ বাকি।

এই নিমন্ত্রণ কি কোনও টি-পার্টির নাকি কোনও ডিনারের? কারণ টি-পার্টি ডিনার-পার্টি সবই ছিল সেবারের শিলং ভ্রমণপর্বে। একটি টি-পার্টি হয়েছিল ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে। বিধান রায় ব্যতীত ছিলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডক্টর জ্ঞান চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ঢাকায় কর্মরত ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং গণ্যমান্য আরও অনেকে। আর একদিন সন্ধ্যায় একটা ডিনার-পার্টি হয়েছিল। আমন্ত্রক ময়ূরভঞ্জের মহারানি সুচারু দেবী। জিৎভূমি বাড়ির অদূরেই ছিল ময়ূরভঞ্জের রাজবাড়ি। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেবের স্ত্রী সুচারু দেবী। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা। মহারানির মেয়ে সিসির সঙ্গে রাণুর খুব অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। রাজবাড়ির ডিনার-পার্টিতে নানারকম আমোদের আয়োজন ছিল। সতীশচন্দ্র রায়ের বিবরণ, 'এক সাহেব ছোক্‌রা শিলঙে বেড়াতে এসেছিল,— সে হাইল্যান্ডার। মেঝের ওপর দুটো কাঠি নিয়ে নাচ দেখালে,— হাতে তার তরবারি। ওয়ার ড্যান্সের মতো কতকটা। ডিনারে বসে রবীন্দ্রনাথ যেন হাসি-আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলেন।' কবি যে তাঁর কবিতায় লিখেছেন না 'আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তার সাজ বাকি।' সেই 'নেমন্তন্ন' এই দু'টির একটি হতে পারে, নতুবা সেটি অন্য আর কোনও দিনের টি-পার্টিও হতে পারে।

তবে যাই হোক, একথা খুব সত্য, রবীন্দ্রনাথ কোনও শৈলশহরে বেড়াতে এসে এমনভাবে হাসি তামাসা মজা আনন্দ উপভোগ কখনও করেননি।

~ journeybybook.com ~

অমিতর বোন শেষের কবিতার সিসি কি শিলং-এর এই সিসিই?

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ শিলংভ্রমণ ১৯২৭-এ, মে-জুন মাসে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভ্রমণের মধ্যে চার বছরের ব্যবধানে। এই চার বছরে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। একদিকে সময়-ক্ষণ পালটায়, আর একদিকে মানুষের মন-মানসিকতাও। 'আজ ছিল ডাল খালি, কাল ফুলে যায় ভ'রে,' এবং বিধাতার বিধানে, পরশু সেই ফুলও আবার ঝরে যাবে।

১৯২৩-এ কবিরা শিলং থেকে কলকাতায় রওনা হন ১৫ জুন তারিখে। কলকাতায় ফিরে স্থির হয় 'বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে বিসর্জন অভিনয়' হবে কলকাতায় ৩১ জুলাই, ১ ও ৩ আগস্ট এম্পায়ার থিয়েটারে। কবির মঞ্চাভিনয় মানে রিহার্সালের পালাটি খুব জোরদার। কবি স্থির করলেন রাণুকে কাশীতে যেতে দেওয়া হবে না— ওকে এই অভিনয়ে নামাবেন। রাণু এর আগে তেমনভাবে কোনও অভিনয় করেনি ; কিন্তু কবির ইচ্ছা রাণু এই নাটকের দলের সঙ্গে থাকুক— ওকে কবি ঠিক তৈরি করে নিতে পারবেন। ছোটখাট নয়, রাণুকে কবি দিলেন অপর্ণার ভূমিকা। সেই ১৮৯০ থেকে যে ক'বার বিসর্জন নাটকে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেছেন, প্রতিবারেই তিনি রঘুপতির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০০-১৯০১ কবি বিসর্জনের শেষ অভিনয় করেন। এর বাইশ বছর পর ১৯২৩-এ বিসর্জন অভিনয়ে সকলেই যখন ভাবছেন রবীন্দ্রনাথ আগের মতোই রঘুপতির ভূমিকাই নেবেন তখন দেখা গেল কবি রাণুকে অপর্ণার ভূমিকা দিয়ে নিজেই হলেন জয়সিংহ। রঘুপতি অভিনয় করেন দিনেন্দ্রনাথ অর্থাৎ দিনু ঠাকুর।

কলকাতায় জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এসেই বিসর্জন নাটকের মহড়ার কাজ শুরু হয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। রাণুর তেমন অভিনয় প্রবণতা এবং দক্ষতা ছিল না। কিন্তু কবি নাছোড়বান্দা। তাকে ঘসে-মেজে তৈরি করে নিতে বদ্ধপরিকর। কলকাতায় মহড়া চলছে, জুনের

~ journeybybook.com ~

শেষে কবি শান্তিনিকেতনে এলেন, রাণুকেও নিজের সঙ্গে নিয়ে এলেন। অভিনয়ের তালিম দিয়ে গেলেন তাকে নিজের কাছে রেখে। তারপরে ১২ জুলাই কবি ও রাণু আবার কলকাতায় এলেন। কবিদের সঙ্গে এনড্রুজ সাহেবও এলেন। অভিনয় শুরুর তারিখ ৩১ জুলাই। জোড়াসাঁকোতে বিসর্জনের মহড়া চলল রীতিমতো পুরোদমে। রাণু এই মহড়ার কথা তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, 'বিসর্জন নাটকে ভানুদাদা জয়সিংহ, আমাকে করলেন অপর্ণা। আমার অভিনয় তাঁর পছন্দ। বারে বারে ওই ভূমিকায় নেমেছি তাই। কিন্তু মহড়ার সময় সে কী শাস্তি! জোড়াসাঁকোর মহড়ার আসর ছিল ঠিক যাত্রার আসরের মতো। মহড়ার চারিদিক ঘিরে লোক। লোক বলতেও সাধারণ নয়, জগদীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্রদের মতো বিশিষ্টবর্গ, তারই মাঝখানে একটুও আড়ষ্ট না হয়ে কেবল বাক্‌ভঙ্গি নয়, অঙ্গভঙ্গি করে পার্ট করতে হবে। ভয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া আমার বাহু কতবার যে সজোরে টেনে স্বচ্ছন্দ করে দিতেন, বকতেন, তার ইয়ত্তা নেই।'

এই মহড়া চলাকালীনপর্বে কবি মহর্ষিভবনের তাঁর তিনতলায় নিজের ঘরে থাকতেন। রাণুও ওই তিনতলাতেই থাকতেন প্রতিমা দেবীর সঙ্গে। কবির ঘরে রাণুর প্রবেশাধিকার ছিল অবাধ। কবির 'বৌমা পাশের ঘরে শোন্ বটে কিন্তু সমস্ত দিন তাঁরা নিচের ঘরে আড্ডা করেন।' কবি তখন রক্তকরবী নাটকের সংস্কারের কাজে একান্তভাবে আত্মমগ্ন। কবির ধ্যানভঙ্গে রাণুর কিছুমাত্র দ্বিধা ও সংকোচ ছিল না। কবি হয়ত রাণুর এই নন্দিনীর মতো অতর্কিত আবির্ভাবে বাধা দিয়েছেন ; রক্তকরবীর রাজার ভঙ্গিতে হয়ত বলেছেন— যাও যাও, আর কথা কয়ো না, সময় নেই। রক্তকরবীর রাজা নন্দিনীকে বলেছে— না না, যেয়ো না, বলে যাও ; আমাকে কী মনে করো বলো। নন্দিনী বলেছে— কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। দেখে আমার মন নাচে। রাজা বলেছে— বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে-ছন্দ বাজে সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহ-নক্ষত্রের দল ভিখারি নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই

~ journeybybook.com ~

নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।

মহর্ষিভবনে কবি যখন রক্তকরবী নাটকটির পাণ্ডুলিপিতে পরিমার্জনার কাজ করছেন সেটা তখন জুলাইয়ের শেষার্ধ ; আর অক্টোবরের প্রথমার্ধে রাণুকে কবি লিখেছেন— 'কাল সন্ধের সময় সেই নন্দিনী নাটকটার একটা পাঠ দিয়েছিলুম [আত্মীয়সভায় পঠিত]। অনেক বদল হয়ে গেচে। জান বোধ হয় এখন তার নাম হয়েছে রক্তকরবী। সবাই শুনে বললে, রাণু না হলে নন্দিনীর ভূমিকা আর কেউ করতে পারবে না।...মনে পড়ল, যখন তুমি জোড়াসাঁকোয় থেকে বিসর্জনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলে সেই সব দিনের কথা,— আমি তখন নন্দিনী নাটকটার সংস্কারকার্যে নিযুক্ত। তুমি তাতে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে নানা প্রকার চেষ্টা করেছ— আমি তাতে প্রকাশ্যে আপত্তি করেছি কিন্তু গোপনে কিছুই যে খুশি হইনি তা মনে ক'রো না। কর্তব্যের টান বলে একটা জিনিস আছে কিন্তু কর্তব্যের বাধার যে কোনও টান নেই এমন কথা জোরের সঙ্গে বলতে গেলে অন্তর্যামী তার প্রতিবাদ করবেন। স্মৃতির চিত্রপটে সেই বাধার ছবিগুলি খুব স্পষ্ট হয়ে জাগছে। বিসর্জনের সেই রিহার্সালপর্বের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে আমার এই তেতলার ঘর ভরা আছে।'

শিলং-এ রাণুর উপস্থিতিতেই রক্তকরবী লিখতে শুরু করেছিলেন কবি। এখন নাটক শুনেও সবাই বলছে— রাণু ছাড়া নন্দিনীর ভূমিকায় আর কাউকে ভাবা অসম্ভব।

আমাদের কথা চলছিল বিসর্জন নিয়ে, সেখানেই আবার ফিরে যাওয়া যাক।

জুলাইয়ের শেষ দিন এবং আগস্টের গোড়ায় মোট তিন দিন কলকাতায় বিসর্জন নাটকের যে অভিনয় হবার কথা ছিল তা বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও বন্ধ রাখতে হয় কবি হঠাৎ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায়। নাটক মঞ্চস্থ না হওয়ায় রাণু জুলাইয়ের শেষে কাশীতে ফিরে যান। কাশীতে রাণু পৌঁছতে না পৌঁছতেই রাণুর বাবা কবির টেলিগ্রাম পান।

~ journeybybook.com ~

রাণুকে পুনরায় কবির কাছে পাঠিয়ে দিতে— ২৫ আগস্ট থেকে বিসর্জনের কয়েকটা শো হবে। রাণুকে কবি ১ আগস্ট (১৬ শ্রাবণ ১৩৩০) চিঠি লিখলেন। 'তোমার বাবজাকে আজ টেলিগ্রাম করা গেছে, দেখি কি উত্তর আসে। যদি ওখান থেকে আনবার লোক কেউ না থাকে তাহলে এন্ড্রুজকে পাঠিয়ে দেব স্থির করেছি।...অন্তত ১৯শে তোমার এখানে এসে পৌঁছন দরকার। আমি তো একরকম সব ভুলে টুলে বসে আছি। ৭টা দিন ভালো করে রিহার্সাল না দিতে পারলে জিনিসটা মনের মতো হবে না। দর্শকদের দল এবার খুব ব্যগ্র হয়ে আছে— মনে করছে ভারি একটা কাণ্ড হবে। সেইজন্যে অভিনয়টাকে সম্পূর্ণ নিখুঁত করে তোলবার ইচ্ছে আছে।'

এই শ্রাবণ ১৩৩০-এ রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গান :

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে,
তাই ফাগুনশেষে দিলেম বিদায়।
তুমি গেলে ভাসি নয়ননীরে
এখন শ্রাবণদিনে মরি দ্বিধায়।
এখন বাদল সাঁঝের অন্ধকারে আপনি কাঁদাই আপনারে,
একা ঝর ঝর বারিধারে ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়।
যখন থাক আঁখির কাছে
তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভরে আছে।
সেই ভরা দিনের ভরসাতে চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,
তবু তোমা হারা বিজন রাতে
কেবল হারাই হারাই বাজে হিয়ায়।

রক্তকরবীতে যেমন রাজার পাশে রঞ্জন এবং আরও কেউ কেউ রয়েছে নন্দিনীকে ভালোবাসার ; রাণুর ক্ষেত্রেও কবির কৌতুকীতে জানা যায় সুন্দরী সপ্তদশীর ভক্তসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। দৌড়ে রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক পিছনে রয়েছেন পঞ্চাশউর্ধ্ব গগনেন্দ্রনাথ

~ journeybybook.com ~

এবং নবীনদের মধ্যে অবশ্যই আরও কেউ কেউ। তাঁদের নিয়ে কবির কৌতুক বেশ মধুর ('তুমি তো জানো, তোমাকে ছাড়া গগনের আর কাউকে পছন্দ হয় না।')। পরে অন্যদের কথায় আসা যাবে।

যাই হোক, আগস্টের শেষ সপ্তাহে অভিনয়ে অপর্ণার ভূমিকায় নামার জন্যে পুনরায় রাণুকে কাশী ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়।

নাটকে যাঁর গান সকলকে মোহিত করেছিল সেই সাহানা দেবী (ঝুনু) তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের অপর্ণা-কে শেখানোর কথা মনে পড়ে। প্রথম দৃশ্যে অপর্ণার ছুটে গিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের পায়ের কাছে ভেঙে পড়া ও দুঃখ বেদনা ক্ষোভজড়িত কাতরকণ্ঠে বলা— বিচার প্রার্থনা করি। এই বিচার প্রার্থনা করি— এইটুকু ঠিকমতো ঠিকভাবে ঠিকভঙ্গিতে কীভাবে কেমন করে বলতে হবে তা বারবার নিজে করে দেখিয়ে দেবার যে শিক্ষা দেওয়া রবীন্দ্রনাথের দেখেছি, তা দেখে তখনই শুধু বিস্ময় বোধ করিনি, তা স্মরণ করে আজও বিস্ময় বোধ করি।...অপর্ণাকে কবির আপন হাতে তিল তিল করে গড়ে তোলার পর যেদিন রঙ্গমঞ্চে অপর্ণার প্রথম অভিনয় দেখি, সেদিন তার অভিনয়, উক্তির মাঝে দেখতে পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির আর একটা দিক।'

এম্পায়ারে তিনটি সন্ধ্যায় অপর্ণার ভূমিকায় রাণু অভিনয় করেন। অভিনয়ের এক সন্ধ্যার ঘটনা রাণুর স্মৃতিচারণায় : 'একবার সে কী কাণ্ড! বিসর্জনের অভিনয় চলছে পুরনো এম্পায়ারে। হঠাৎ কি করে উপর থেকে আগুনের ফুলকি পড়ল। ভয় পেয়ে ছুট লাগিয়েছি গ্রিনরুমের দিকে। খপ্ করে হাত টেনে ধরলেন জয়সিংহরূপী ভানুদাদা। পরিস্থিতির উপযোগী দু'একটা কথা ছুঁড়ে দিয়ে অবিচল অনর্গল সংলাপ চালিয়ে গেলেন তিনি।'

এইরকমই এক বিপর্যয়ের মুখে কবি পড়েছিলেন চীনদেশে এক সভামঞ্চে বক্তৃতাদান কালে। উপরের গ্যালারির কিছু অংশ ভেঙে মাথায় পড়বার উপক্রম। কিন্তু কবি অবিচলিতভাবে স্থির থেকে বক্তৃতা

~ journeybybook.com ~

দিয়ে চললেন। সেটা ১৯২৪-এর এপ্রিল। কবি ২২ তারিখ এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে রাণুকে লেখেন, 'যদি আমি ভয়ে ব্যস্ত হয়ে পালাবার পথ দেখতুম তাহলে সেই তিন হাজার লোক পালাবার ঠেলাঠেলিতে সর্বনাশ কাণ্ড ঘটাত।...আমার মনে পড়ল সেই বিসর্জনের অভিনয়ের কথা— পিঠের দিকে অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে, আর আমি একটি ভয়ত্রস্তা বালিকার হাত চেপে ধরে অভিনয় করে যাচ্ছি। আমি সেদিন যদি পালাবার ভাব দেখাতুম তাহলে সেই মুহূর্তেই মহাকালীর কণ্ঠহারের জন্যে নরমুণ্ডের অভাব ঘটত না।'

বিসর্জনে জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ সেবার ওভারস্পিরিটেড ছিলেন। তাঁর সেই অভিনয় দেখে কে বলবে তিনি ৬২, তাঁর জয়সিংহকে মনে হচ্ছিল ২৬। তাঁর অভিনয় দেখে দর্শকদের

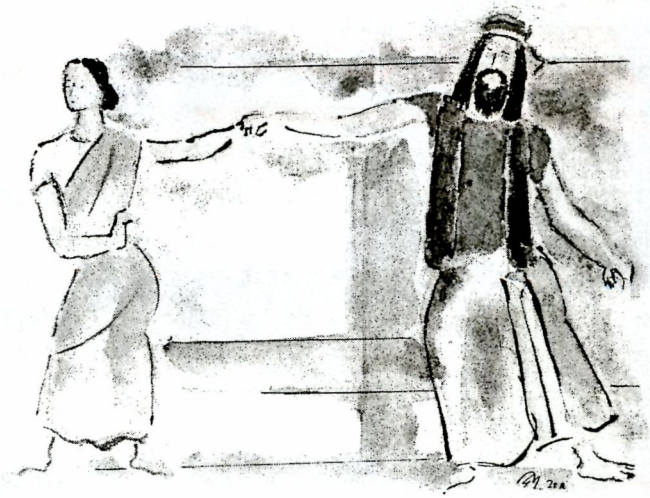

মনে হচ্ছিল এ যেন অভিনয় নয়। আর অপর্ণার ভূমিকায় রাণুর অভিনয়ও খুবই সুন্দর খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। দর্শকদের মুখে এবং

~ journeybybook.com ~

সমালোচকদের কলমেও রাণুর প্রশংসা ছিল অকৃপণ। শুধু অপর্ণা চরিত্রে সুঅভিনয়মাত্র নয়, রাণুর রূপলাবণ্যও দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি সস্ত্রীক কাশীতে এসেছিলেন, রাণুর বয়স তখন ষোলো। মাদাম লেভি রাণুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজের ডায়েরিতে লেখেন, কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে রাণুর বাবা এসেছিলেন। 'কবির ভাষায় বললে তার অপরূপ লাবণ্যের সঙ্গে মিশেছে হরিণীর অনাবিল চঞ্চলতা।' (অনূদিত)।

এই সপ্তদশী সুন্দরীর প্রতি এলমহার্স্টও কিছুটা অনুরক্ত হয়ে পড়েন। আর যিনি রূপমুগ্ধ হয়ে রাণুর একান্ত প্রণয়প্রার্থী হন তিনি পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের প্রফুল্লকুমার ঠাকুরের পুত্র পূর্ণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁকে নিয়ে রাণু-প্রসঙ্গে সেই সময় যথেষ্ট জটিলতাও সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ রাণুর অনুরক্তদের নিয়ে লঘুভাবে কৌতুক-রসিকতাই করেছিলেন ; পরে কিন্তু তা কিছু জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নামও জড়িয়ে পড়ে।

রসিকতা কখনও গগনেন্দ্রকে নিয়ে কখনও এলমহার্স্টকে নিয়ে কখনও নামহীন প্রণয়প্রার্থীদের নিয়ে, আবার কখনও বা নিজেকে নিয়েই।

কলকাতায় অভিনয়ের পালা সাঙ্গ করেই রাণু কাশীতে ফিরে যান। ৬ সেপ্টেম্বর কবি রাণুকে লেখেন, 'প্রবীণ ও বিখ্যাত অভিনেতা অমৃত বোস [অমৃতলাল বসু] তোমার অভিনয়ের জয়গান করে ইংরেজি দৈনিক ডেলি নিউজে একটা পত্র লিখেছে। পড়ে দেখো—বাবজাকে দেখিয়ো, তিনি খুশি হবেন।'

১২ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে কবি লিখলেন, 'ইংলিসম্যানে তোমার যে স্তবগান তোমার কোনও ভক্ত করেছেন, তুমি ভাবছ সে আমি যথাসময়ে পড়িনি! পড়েছি, এবং তোমাকে পাঠাব কি না সেকথাও মনে মনে

~ journeybybook.com ~

আলোচনা করেছি। কিন্তু যেহেতু নিশ্চয় জানতুম সেই লেখাটিও তোমার নয়নগোচর করবার জন্যে আগ্রহবান যুবকের অভাব হবে না সেইজন্যে তোমার উপর ওই পত্রাংশবৃষ্টি আর করলুম না।'

১৭ সেপ্টেম্বর কবি চিঠিতে লিখলেন, 'যদি প্রশংসা শুনে এখনো পেট ভরে না থাকে তাহলে প্রবর্তক নামক মাসিকপত্রে তোমার অভিনয়ের যে সমালোচনা বেরিয়েচে সেটা পড়ে দেখো।' রাণুর সঙ্গে কবিও প্রশংসিত। তাই কবি কৌতুক করে লিখছেন, 'তোমার সিংহাসনের পাশে যে-আমাকেও স্থান দিয়েছে সে কম কথা নয়। প্রবর্তক হয়ত তোমাদের হাতে না পড়তে পারে অতএব সমালোচনাটা কেটে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। কবির চিঠি রাণুকে। এই চিঠির অল্প অংশ পূর্বে উদ্ধৃত করেছি যেখানে রক্তকরবী-পাণ্ডুলিপির সংস্কারের কথা আছে। কবিকণ্ঠে রক্তকরবী নাটকটা শুনে সবাই বলে— রাণু ছাড়া নন্দিনীর ভূমিকায় আর কাউকে মানাবে না। যেন নন্দিনী রাণুই। রবীন্দ্রনাথ রাণুকে বলছেন, 'তোমার উপরে সকলেরই পক্ষপাত। আমার কথাটা তো জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেছে, গোপন করবার চেষ্টা করা মিথ্যা। গগন স্পষ্টই কবুল করলেন, তোমাকে তাঁরও মনে লেগেছে, সেকথা তিনি ভুলতে পারেন না।'

আমরা আগেই বলেছি রাণুর অনুরক্ত দলের মধ্যে এলমহার্স্ট সাহেবও একজন। পূর্ববর্তী চিঠির ঠিক একমাস পর ১৩ নভেম্বর ১৯২৩ তারিখে রাজকোট থেকে রাণুকে কবি লেখেন, 'তোমাকে একটা সুখবর দেবার জন্যে এই চিঠি লিখতে বসেছি। এলমহার্স্ট এসে পৌঁচেছে। সে বোম্বাই থেকেই কোনও এক জায়গায় দৌড় দেবার চেষ্টায় ছিল আমি তাকে ডাকিয়ে এনেছি। সে এখন আমার সঙ্গে ঘুরছে। কাল তাকে কথায় কথায় বলছিলুম রাণু বিসর্জনে খুব ভালো অভিনয় করেছিল। পৃথিবীসুদ্ধ

~ journeybybook.com ~

লোক তাই নিয়ে আলোচনা করছে। শুনে এলমহার্স্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ভাগ্যি আমি ছিলুম না। থাকলে তার ভাগ্য নিয়ে কী মুস্কিল হত আমি তো কিছু বুঝতে পারলুম না। উমা যখন তপস্যা করেছিলেন তখন তিনি অপর্ণা হয়েছিলেন, তখন শিবের তিন নেত্রই তাঁর উপর পড়েছিল— কিন্তু তুমি যখন অভিনয় সাধনা করে অপর্ণা হলে তখন হাজার নেত্র তোমার উপর পড়ল, শিব-অশিব কেউ বাদ যাচ্ছে না। তোমার সাধকদের মধ্যে ইদানীং কার কি দশা ঘটেছে তার হাল খবর কিছুকাল পাইনি, আরও কিছুকাল পাব না। কিন্তু আন্দাজ করতে পারচি। পুরাণে লিখছে গৌরী ভানুর দিকে তাকিয়ে তপস্যার উগ্রতা বাড়িয়ে তুলে অবশেষে সকলপ্রকার ভোগসামগ্রীর সঙ্গে গাছের পত্র পর্যন্ত যখন ত্যাগ করলেন তখন তিনি বরলাভ করতে পেরেছিলেন— তোমার তপস্যায় আমি তো দেখছি পত্রসংখ্যা বাড়ছে বই কমছে না— তাতে তোমার বরলাভের কোনও বাধা ঘটবে না, এও স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে। অপর্ণার এই তপঃকাহিনী লেখবার জন্যে পুরাকালে এক কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন— বর্তমান কালেও এক কবিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এখনো তিনি অবাক হয়ে আছেন ; হয়ত কোনওদিন ছন্দে বন্ধে তাঁরও বাক্‌স্ফূর্তি হতে পারে। আপাতত তাঁর দুটি একটি কথা সামান্য পত্রপুট পূর্ণ করে ডাকবাহন যোগে চলাচল করছে— কিন্তু যেখানে শ্রাবণের ধারায় পত্র বর্ষণ হচ্ছে সেখানে এ পত্র লক্ষগোচর না হতে পারে।'

১৯২৪। জানুয়ারির ৯-১০ তারিখ নাগাদ শান্তিনিকেতন থেকে রাণুকে কবি লিখছেন, 'সম্প্রতি কাশীর দিকে স্বর্ণচক্রের একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, তাই লৌহচক্রযানে ভানু তদভিমুখে যেতে উৎসুক। এর থেকে মনে কোরো না ভানুর মনে আর কোনও চক্রান্ত নেই। কিন্তু মনের কথা অনুমানে বুঝে নিতে হবে। সোনার চাকার কথা

~ journeybybook.com ~

ঘর্ঘর ধ্বনি করতে সংকোচ বোধ করে না— কিন্তু চক্রবাকের বাণী অন্ধকার রাত্রে নির্জন নদীপার থেকে কদাচিৎ শুনতে পাওয়া যায়।'

কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির আমন্ত্রণ। তা ছাড়া সেখানে দেশীয় রাজাদেরও সমাগম হবে। বিশ্বভারতীর অর্থাভাব ; সুতরাং তাঁদের কাছে বিশ্বভারতীর জন্যে দরবার করারও সুযোগ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া রাণুকেও কাছে পাওয়া যাবে।

কলকাতা থেকে ১৭ জানুয়ারি রাত্রে কাশীযাত্রা। সঙ্গে ইতিহাসবিদ্ কালিদাস নাগ এবং পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী এবং গৃহভৃত্য বনমালী। কাশী থেকে কলকাতার পথে যাত্রা করেন ২৩ জানুয়ারি। দিন পাঁচেক কাশীতে কাটিয়ে কবির কলকাতায় ফেরা। ফেরার পথে প্রথমে আসা হল মোগলসরাই। প্রথমে প্রতিমার পুপের জন্যে রাশি-রাশি পুতুল কেনা। পুতুল কেনা শেষ হলে প্রতিমার চোখ যায় কাশীর বিখ্যাত পেয়ারার দিকে। দু'ঝাঁকা ভরতি পেয়ারা কেনা হল। তারপরে তা ট্রেনের কামরায় তুলে নেওয়া হল। এক বুধবারে কবির কাশী থেকে বেরন আর পরের বুধবার ৩০ জানুয়ারি কবি শান্তিনিকেতন থেকে চিঠি লিখলেন রাণুকে। কাঁচা-পাকা পেয়ারার গল্প এবারের চিঠির প্রধান আকর্ষণ। কবির চিঠি, 'দ্বিতীয় শ্রেণির তিনটে সিটের মধ্যে একটা সিট্ পেয়ারায় ভরে গেল। দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে আশা করে একটু কাঁচা গোছের পেয়ারা কেনা হয়েছিল, অথচ তাতে পাকা রঙটি ধরেছে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে মনে ভাবলুম এ তো দেখি আমার রাণুরই মতো— তার মধ্যে কোথাও বা কাঁচা, কোথাও বা শ্যামল, কোথাও বা গৌর, কোথাও বা কঠিন, কোথাও বা কোমল। এই রকম চিন্তা করতে করতে দানাপুরে এসে উপস্থিত।' ৩০ জানুয়ারি ১৯২৪ শান্তিনিকেতন থেকে লেখা কবির এমনতর চিঠি পেয়ে অষ্টাদশীমুখী এক ভরা যুবতীর গাল লাল হয়ে যে শরীরের সর্বাঙ্গ চিনচিন করে উঠবে একথা কারওর অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিশেষ করে কাঁচা-পাকা কাশীর পেয়ারার সঙ্গে কাশীর

~ journeybybook.com ~

সুন্দরী ওই মেয়েটির সাদৃশ্য নির্বাচন অবশ্যই যথেষ্ট সুস্পষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ কৌতুক। এই তুলনার ভিতরের কৌতুকটুকু রাণুর বোঝার মতো ক্ষমতা না থাকলে কবি তাকে লিখতেন না। কবি তাঁর কোনও নায়িকার রূপের সঙ্গে এমন তুলনা নিশ্চয় কখনও করতেন না ; কিন্তু রাণুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীর নৈকট্য কবিকে এমন চিঠি লিখতে বাধা দেয়নি। এ-চিঠি পড়ে রাণু হয়ত লজ্জা পেয়েছে, কিন্তু কবির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি 'দীর্ঘকাল স্থায়ী' হোক সে-ইচ্ছাটি রাণুরও মনে-প্রাণে-অন্তরে ছিল কবিরই মতো পূর্ণমাত্রায়। রাণু এ-চিঠি পড়ে নিশ্চয় খুশি হবে জানতেন বলেই রবীন্দ্রনাথ ওভাবে লিখতে পেরেছিলেন। রবি ও রাণুর মধ্যে বয়সের যে-ব্যবধানই থাক, সম্পর্কের একটা 'secret' তো ছিলই। কবে কোথায় কখন বা কতদিন রাণু রবীন্দ্রের 'সমস্ত আদর' পেয়েছিল তা আমাদের জানা নেই ; কিন্তু একদিন যে সে আদর রাণু পেয়েছিল এবং তার 'সমস্ত শরীর ছেয়ে সে আদর' যে তার মনকে ভরে দিয়েছিল সে-কথা তো এতটুকু মিথ্যে নয়। এই secretটুকু তো রাণু ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পৃথিবীতে আর কারওরই জানা নেই। এ যে একান্ত গোপন একান্ত ব্যক্তিগত এই দুটি নারী-পুরুষের মধ্যবর্তী ইতিহাস।

ছেলেমানুষ রাণুও তার উচ্ছ্বসিত চিঠিগুলিতে কবিকে একান্তভাবে 'আদর' জানাতে জানাতে এবং 'চুমু'র পর 'চুমু' বিতরণ করতে করতে কখন যে সে একাদশী থেকে অষ্টাদশীতে পৌঁছে গেছে হয়ত নিজেরও সে-বিষয়ে তার ধারণা ছিল না। উন্মেষিত যৌবনের এই সাতটি মধুর বসন্ত কবির সান্নিধ্যে একটা মোহময় আবেগের স্রোতে ভেসে বেড়িয়েছে রাণু। কবিকে লেখা রাণুর চিঠির সংখ্যা ৬৮। এই সংখ্যা অবশ্যই এযাবৎ প্রাপ্ত চিঠির সংখ্যা। ১৯ সংখ্যক চিঠিতে কবিকে প্রণাম। ২৩ সংখ্যক চিঠি থেকে 'ভারি দুষ্টু' কবির ভাগ্যে জুটেছে দ্বাদশী রাণুর প্রেরিত চুম্বন। চুম্বন গ্রহণে কবির তত আপত্তি নেই, তবে চুম্বন প্রদানে হয়ত বা দ্বিধা আছে তাঁর। সাময়িকপত্রে যখন কবি ধারাবাহিক নৌকাডুবি

~ journeybybook.com ~

লেখেন তখন নদীর বালির তটে দুর্ঘটনার অন্তে রমেশ ও কমলার প্রথম সাক্ষাৎ দৃশ্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে— 'তখন তাহার [নববধূর] লজ্জা করিবার সময় নহে। রমেশের দুই বাহুর মধ্যে সে আপনি নিবিড় আগ্রহের সহিত আপনার স্থান করিয়া লইল। রমেশ মৃদু সন্তর্পণে তাহার মস্তক চুম্বন করিল। তাহার মাথার কাছে মুখ রাখিয়া অতি ধীরে ধীরে কহিল— আমাকে তুমি ভালোবাসিয়ো।' এই নৌকাডুবিই যখন বই হয়ে বেরল তখন রবীন্দ্রনাথ চুম্বনদৃশ্যটি পরিত্যাগ করলেন। ওই বর্ণনার শেষ দুটি বাক্য কবি কর্তৃক বর্জিত হল।

নৌকাডুবিতে রমেশের চুম্বনেচ্ছা সংবরণ করলেও রবির প্রতি রাণুর চিঠিতে চুম্বনের যে উচ্ছলিত সুধাস্রোত প্রবাহিত, তাকে কবির দিক থেকে সরাসরি রোধ করতে বা প্রত্যাখ্যান করতে কখনও দেখা যায়নি। রাণুর চিঠি ; চুমু সংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যান :

চিঠি ২৩ সংখ্যক [আগস্ট ১৯১৮] আমি আপনাকে চুমু দিচ্চি।
চিঠি ২৪ সংখ্যক [আগস্ট ১৯১৮] আপনাকে আমি চুমু দিচ্চি।
চিঠি ২৫ [আগস্ট ১৯১৮] আমার চুমু আপনাকে দিচ্চি।
চিঠি ২৬ [আগস্ট ১৯১৮] আমি আপনাকে চুমু আর আদর দিচ্চি।
চিঠি ২৭ [আগস্ট ১৯১৮] আপনাকে চুমু দিচ্চি।
চিঠি ৩০ [আগস্ট ১৯১৮] আপনাকে আদর দিচ্চি।
চিঠি ৩১ [আগস্ট ১৯১৮] আপনাকে চুমু দিচ্ছি।
চিঠি ৩৩ [২৯ আগস্ট ১৯১৮] আপনাকে আমার চুমু দিচ্চি।
চিঠি ৩৪ [সেপ্টেম্বর ১৯১৮] আপনাকে আদর দিচ্চি।
চিঠি ৩৫ [সেপ্টেম্বর ১৯১৮] আপনাকে আমি আদর দিচ্ছি।
চিঠি ৩৬ [সেপ্টেম্বর ১৯১৮] আপনাকে চুমু দিচ্চি।
চিঠি ৩৯ [সেপ্টেম্বর ১৯১৮] আমার আদর জানবেন।
চিঠি ৪০ [সেপ্টেম্বর ১৯১৮] আপনাকে চুমু দিচ্ছি।

~ journeybybook.com ~

চিঠি ৪১ [অক্টোবর ১৯১৮] আপনি আমার আদর জানবেন। আর চুমু।
চিঠি ৪২ [অক্টোবর ১৯১৮] আপনাকে আমার আদর দিচ্ছি। চুমুও।
চিঠি ৪৩ [অক্টোবর ১৯১৮] আপনাকে আদর দিচ্ছি। চুমুও।
চিঠি ৪৪ [৩ নভেম্বর ১৯১৮] আপনাকে আদর দিচ্ছি।
চিঠি ৪৫ [১৯১৮] আপনাকে আমি অনেক আদর আর চুমু দিচ্ছি।
চিঠি ৪৭ [২০ নভেম্বর ১৯১৮] আপনাকে চুমু দিচ্ছি।
চিঠি ৪৮ [নভেম্বর ১৯১৮] আমি আপনাকে চুমু দিচ্ছি।
চিঠি ৪৯ [ডিসেম্বর ১৯১৮] আপনাকে আদর দিচ্ছি।
চিঠি ৫০ [ডিসেম্বর ১৯১৮] আপনাকে চুমু দিচ্ছি।

১৯১৯-এ রাণু কবিকে চিঠি দেন ১২টি, ১৯২৪-এ ১টি, ১৯৩৭-এ ১টি এবং ১৯৪০-এ ২টি। ১৯১৯ থেকে দেখি ডাকযোগে প্রেরিত চুম্বন বন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ রাণুকে বালিকাই মনে করুন, কন্যাসমাই মনে করুন কিংবা পুরুষের প্রেরণাদাত্রী সুন্দরী নারীই মনে করুন— রাণুকে লেখা কবির কোনও চিঠিতেই কিন্তু শরীরছোঁয়া কিংবা চুম্বন-প্রতিচুম্বনের আভাস মাত্র নেই। রাণুর চুম্বন প্রদানে কবি কখনও বাধা দেননি ; বরং বলা যায় রাণুর আদর কবি সাদরে গ্রহণই করেছিলেন।

১৯১৭ জুলাই (১৩২৪ শ্রাবণ) থেকে কবিকে রাণু চিঠি লিখতে শুরু করলেও ১৯১৮ আগস্টে (১৩২৫ শ্রাবণ) রাণু তার ২৩ সংখ্যক চিঠি থেকে কবির শরীর স্পর্শ করে ; কবিকে চুম্বন প্রদান শুরু করে।

১৩২৫ শ্রাবণে কবিকে লেখা রাণুর পত্রসংখ্যা ১৪ (১৬-২৯ সংখ্যক), ১৩২৫ ভাদ্রে রাণুর পত্রসংখ্যা ৭ (৩০-৩৬ সংখ্যক) এবং ১৩২৫ আশ্বিনে রাণুর পত্র ৬ (৩৭-৪২ সংখ্যক)। অন্যদিকে ১৩২৫ শ্রাবণে রাণুকে লেখা কবির পত্রসংখ্যা ১২ (১২-২৩ সংখ্যক), ১৩২৫ ভাদ্রে কবির পত্রসংখ্যা ৭ (২৪-৩০ সংখ্যক) এবং ১৩২৫ আশ্বিনে কবির পত্র ৫ (৩১-৩৫ সংখ্যক)। অর্থাৎ এই তিন মাসে রাণু কবিকে লিখেছেন ২৭টি চিঠি আর কবি রাণুকে ২৪টি।

~ journeybybook.com ~

১৩২৫ শ্রাবণে রাণু যখন শ্রাবণের ধারার মতো পত্রযোগে কবিকে আদর-চুম্বনাদি প্রেরণ করে চলেছেন তখন সেই শ্রাবণে চুম্বনসিক্ত রবীন্দ্রনাথ রাণুকে কী চিঠি লিখছেন দেখা যাক। শ্রাবণের একদিন আগে ৩১ আষাঢ়ের একটা চিঠির একটু অংশ উদ্ধৃত করে নিই প্রথমে।

'একটা কথা তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিই। তুমি বলেছ [হ্যাঁ শুনুন কেউ বয়েস জিজ্ঞেস করলে বলবেন সাতাশ] কেউ আমাকে বয়েস জিজ্ঞাসা করলে সাতাশ বলতে। আমার ভয় হয় পাছে লোকে সাতাশ শুনতে সাতাশি শুনে বসে, আর সেইটেই সহজে বিশ্বাস করে বসে। সেইজন্যে, তুমি যদি রাজি থাক তাহলে আমি আর একটা বছর কমিয়ে বলতে পারি। কেননা ছাব্বিশ বললে ওর থেকে আর কিছু ভুল করবার ভাবনা থাকে না।'

—৩১ আষাঢ় ১৩২৫

এবার শ্রাবণের চিঠি। 'শ্রীমতী রাণুসুন্দরী'কে 'রবিদাদা'।

'রাণু, তুমি যদি আমাকে যথার্থ ভালোবাস তাহলে আমার ভালো কাজে তোমার আনন্দ যেন হয়, আমি সকলকেই ভালোবাসি এতেই যেন তোমার মন প্রসন্ন হয়, যারা আমার কাছে আসবে তারা আমার কাছ থেকে যেন প্রীতির দান ও পূজার নির্মাল্য নিয়ে যেতে পারে এই তোমার যেন কামনা হয়। আমাকে ছোটো করে দেখো না, ছোটো করতে চেয়ো না— তাহলেই, আমার সঙ্গ পেয়ে আমার স্নেহে আমার আশীর্বাদে তুমি বড় হয়ে উঠবে, তোমার মন তাহলে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হবে। আমি ভিতরের সৌন্দর্যকে সবচেয়ে ভালোবাসি— যাদের স্নেহ করি তাদের মধ্যে সেই সৌন্দর্যটি দেখবার জন্যে আমার সমস্ত মনের তৃষ্ণা। মেয়েদের মধ্যে এই সৌন্দর্যটি যখন দেখা যায় তখন তার আর তুলনা কোথাও থাকে না। কিন্তু মেয়েরা যখন কেবল সংসারে জড়িয়ে থাকে, সব তাতেই কেবল আমার করে, নিজের ছোটো ছোটো সুখ-দুঃখকে নিয়ে পৃথিবীর সব মহৎ লক্ষ্যকে আড়াল করে রাখে, যখন তারা বড়

~ journeybybook.com ~

চেষ্টার বাধা, বড় তপস্যার বিঘ্ন হয়ে কেবলমাত্র লোকের মন ভোলানোকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে রাখে তখন বাইরে তাদের যতই সৌন্দর্য থাক সে সৌন্দর্য মায়ামাত্র, সে সৌন্দর্য সত্য নয়। আমি এই আশা করে আছি আমার কাছ থেকে তুমি এই কথাটি অন্তরের সঙ্গে বুঝে নেবে— তাহলেই তুমি আমাকে সত্য করে বুঝতে পারবে। আমাকে যদি সত্য করে বুঝতে না পার তাহলে আমাকে সত্য করে ভালোবাসতেও পারবে না— তাহলে আমাকে তুমি তোমার খেলার পুতুল করে রাখতে চাইবে। কিন্তু আমার বিধাতা তো আমাকে পুতুল করে পাঠাননি— আমার কণ্ঠে তিনি গান দিয়েছেন, আমার হৃদয়ে তিনি প্রেম দিয়েছেন, আমার জীবনে তাঁর আদেশ আছে, আমার ললাটে তাঁর আশীর্বাদ আছে, আমাকে তিনি সংসারের খেলায় ভুলিয়ে রাখতে দিলেন না— আমাকে তিনি তাঁর কাজে ডেকেচেন— পৃথিবীময় তাঁর কাজে আমাকে ফিরতে হবে— সেই সব কাজে যারা আমার সহায় তারাই আমার আত্মীয় তারাই আমার বন্ধু, আমার ঠাকুর তাদেরই কাছে আমাকে চিরদিন রাখবেন।'

—৯ শ্রাবণ ১৩২৫

'তুমি আমাকে সকল রকমে যদি না জান তা হলে আমার সঙ্গে তোমার ব্যবহার ঠিক হবে কেন? আমাকে ভালো করে সত্য করে বুঝতে চেষ্টা ক'রো রাণু— যেখানে আমি সকল লোকের, যেখানে আমি সংসারের কাজ করবার ক্ষেত্রে, সেখানে আমাকে যদি না চিনতে পারো তাহলে আমার কাছে এসেও আমার আসল কাছে আসা হবে না।...খুব বেদনার সময় তুমি যখন তোমার সরল ও সরস জীবনটি নিয়ে খুব সহজে আমার কাছে এলে এবং এক মুহূর্তে আমার স্নেহ অধিকার করলে তখন আমার জীবন আপন কাজে বল পেলে— আমি প্রসন্ন চিত্তে আমার ঠাকুরের সেবায় লেগে গেলুম।'

—১১ শ্রাবণ ১৩২৫

~ journeybybook.com ~

'মনের ভিতরের দিকে আমার আর বয়স হল না— আমি সাতাশের চেয়েও কম— আমি জানি তাই তোমার ইচ্ছে করে আমাকে ছোটো ছেলের মতো সাজাতে, এবং যত্ন করতে, আদর করতে।'

—১৫ শ্রাবণ ১৩২৫

'সকলের চেয়ে বড় ভালোবাসা হচ্ছে সেই, যাতে মানুষ মানুষকে নিজের দিকেই টানে না, বড়র দিকে অগ্রসর করে, মুক্তির দিকে সাহায্য করে, ভালোর দিকে প্রেরণ করে আনন্দিত হয়। এই ভালোবাসা দূরে থেকেও নিকটে থাকে এবং নিকটে থেকেও আচ্ছন্ন করে না। এই ভালোবাসাই ঈশ্বরের দয়ারূপে মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের কাছে আসে— এবং স্পর্শমণির মতো আমাদের মধ্যে যা কিছু মন্দ আছে মলিন আছে তাকে উজ্জ্বল করে নির্মল করে তোলে— এতে সংশয় নেই, ক্লান্তি নেই, গ্লানি নেই। সংসারের কল্যাণের জন্যে এই প্রেম তোমার মধ্যে বিকশিত হোক এই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি।'

—১৮ শ্রাবণ ১৩২৫

'চিরদিন আমার মনটা পথের পথিক— পান্থশালায় কখনও কখনও একরাত্রি-দুরাত্রি থাকে আবার তাকে বেরতেই হয়— চুপ করে বসে বসে জিনিসপত্র গুছিয়ে বিছানাপত্র পেতে আদরে যত্নে আরামে নিজেকে বা আমাকে ভোগ করবার ছুটি তার নেই। দুর্বল মন মাঝে মাঝে আরাম করতে চায় কিন্তু প্রবল আদেশ তাকে টেনে বের করে। এই জন্যে ঘর আমার নয়, সুখ আমার নয়, কোনও বিশেষ মানুষ আমার নয়। আমি তাঁরই যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের। এখনো তাঁর উপযুক্ত সঙ্গী হতে পারিনি— এখনও 'ঘরে আধা বাইরে আধা'— কিন্তু সে আধা একদিন হয়ত ঘুচবে। কিন্তু মোটের উপরে আমি মুক্তিকে ভালোবাসি, এবং যে ভালোবাসা মুক্ত আমি সেই ভালোবাসাকে বিধাতার দান বলে গ্রহণ করি। আমার ভালোবাসাও যদি মানুষকে মুক্তি না দিয়ে তাকে কেবল আমার মধ্যেই বদ্ধ করে ফেলে তাহলে তাতে আমি দুঃখ পাই, লজ্জা বোধ করি।'

—২৪ শ্রাবণ ১৩২৫

~ journeybybook.com ~

বিধাতার নর-নারীর সম্পর্ক এমনই বিচিত্র, এমনই নিত্যনতুন, প্রতি পরস্পরের নৈকট্যে অনুকূলতায় অন্তরঙ্গতায় আন্তরিকতায় ; এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতিতে ভালোবাস... পূর্ববর্তী কোনও সংকল্প কোনও প্রতিজ্ঞা সবসময় কখনও স্থির থাকতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষে ব্যতিক্রম থাকতে পারে— তা আমাদের জানা নেই ; কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রকৃতির বিধানও অনেক সময়েই মানুষের পক্ষে একান্তই অলঙ্ঘনীয় হয়ে উঠতে পারে। যতই কবির বয়স হোক বাষট্টি, মনে প্রাণে শরীরে হৃদয়াবেগে কর্মক্ষমতায় বার্ধক্য তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। এ-কথাটা কবির ক্ষেত্রে সত্যসত্যই সত্য। তিনি যে রাণুকে মজা করে তাঁর বয়স 'সাতাশ' বলেছিলেন সেটা কিন্তু আদৌ মিথ্যা নয়। পঞ্জিকার হিসাবে তিনি বাষট্টি ; কিন্তু চিন্তায় ভাবনায় প্রেমে ভালোবাসায় বিস্ময়কর কর্মক্ষমতায় এবং অনির্বচনীয় দেহসৌষ্ঠবে ও রূপে তিনি সেইসময় যেমন ছিলেন নবীন এবং সবুজ, তেমনই সত্যসত্যই তখন তাঁর বয়স ছিল 'সাতাশ'ই। কলকাতা থেকে কাশীর পথে রওনা হবার দুদিন আগে এড্‌ওয়ার্ড টমসনকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বিশ্বভারতীর ভার নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছি। অর্থের চিন্তা করতে করতে আমার মন বৃদ্ধ হয়ে যাচ্চে। আমি সেদিন পর্যন্ত ষাট বৎসরের পূর্ণ যৌবন ভোগ করছিলুম। দুই বৎসরের পরেই হঠাৎ তেষট্টি বৎসরের বুড়ো হয়ে উঠেছি। একদিন আমার গর্ব ছিল যতই আমার বয়স হোক্ না কেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না— কিন্তু সে পণ রক্ষা করতে পারলুম না।' এই কথাগুলো পরিহাস করে তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল যাঁকে তখনো পর্যন্ত বার্ধক্য স্পর্শ করতে পারেনি। তবে বয়স যে তাঁর বাড়ছে এবং পূর্ণ যৌবনও যে তাঁর চিরকালের জন্য ভোগ করা সম্ভব নয় সেটাও কবি ভালো করেই জানতেন। তাই 'সাতাশ'-এর সঙ্গে 'তেষট্টি'র একটা দ্বন্দ্ব ভিতরে ভিতরে শুরু হয়েই গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কথার ওপর নির্ভর

~ journeybybook.com ~

করেই বলা যেতে পারে, কবি এই মুহূর্তে তাঁর যৌবন ও বার্ধক্যের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। অনাকাঙ্ক্ষিত বার্ধক্য প্রায় দোরগোড়ায় একটু একটু উঁকি মারছে অন্যদিকে চঞ্চল অদ্ভুত সবুজ-যৌবন অনিবার্য অস্তাচলমুখী। রাণুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়মুহূর্তে কবির বয়স ছাপ্পান্ন— কবির নির্দেশিত হিসাবে তিনি তখন পূর্ণ যৌবনের অধিকারী। আর ১৯২৪-এর জানুয়ারিতে কবির বয়স বাষট্টি বছর আট মাস। ছাপ্পান্ন বছরে কবি যেভাবে 'সাতাশ' বছরের কাছাকাছি ছিলেন, তেষট্টির মুখে পৌঁছে সেই 'সাতাশ'এরও বয়োবৃদ্ধি ঘটেছে অনিবার্যভাবে। শিলংপাহাড়ে ভ্রমণরতা রাণু যখন সতেরো তখন সেই 'সাতাশ'-এর বয়স বেড়ে হয়েছে তেত্রিশ। রাণুর প্রথম পর্বের চিঠিতে উচ্ছ্বসিত চুম্বন উপহার পাওয়া সত্ত্বেও কবি অনেক সংযত ; কবির চিঠির ভাষা উপদেশাবলি দেখে কে বলবে তিনি সাতাশ? কারওরই বুঝতে অসুবিধে হবে না এচিঠি ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সী রবীন্দ্রনাথের লেখা। কিন্তু ১৯২৩-এ শিলংভ্রমণ ও বিসর্জন অভিনয়-পরবর্তী বেশ কয়েকটি চিঠি পড়ে মনে হয় সত্যিই সাতাশ বছর বয়সি কোনও যুবকের চিঠি নাকি কোনও সপ্তদশীকে? আমরা আগেই বলেছি রাণুর চিঠিতে চুম্বনবর্ষণ বন্ধ হয়ে যায় ১৯১৮ সালের পর থেকে। ১৯১৯ থেকে কবিকে লেখা রাণুর চিঠিতে উচ্ছল তারল্য ও আবেগ অনেকটাই অনুপস্থিত। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ প্রেমতত্ত্ববিষয়ক চিঠিগুলি রাণুর মন ও মানসিকতা পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছে। বাইরের উচ্ছ্বাস বাহ্যত প্রশমিত হয়েছে, এবং ভিতরের ভালোবাসা ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। রাণু যেন আর বালিকা নন।

১৯১৯-এ কবিকে লেখা রাণুর চিঠির সংখ্যা ১২। ১৯১৯-এর পরেই যে চিঠি পাই সেটা ১৯২৪-এ লেখা চিঠি। অন্যদিকে ১৯২০ থেকে ১৯২৩ এই সময়পর্বে রাণুকে লেখা কবির চিঠির সংখ্যা ৬০। ১৯২৩-এ শিলংভ্রমণ সাঙ্গ করে ফেরার পর এবং বিসর্জন অভিনয়ের

~ journeybybook.com ~

পর রাণুকে লেখা কবির চিঠির ভাষায় ও ভঙ্গিতে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যে কবি একদিন রাণুকে নারীর প্রেমের প্রকৃত সত্য ও শক্তি কোথায় ব্যাখ্যা করেছিলেন, শিলং-পরবর্তী রাণুকে লেখা সেই কবির চিঠি অনেকটাই লঘু, কিঞ্চিৎ বুঝি বা তরল। হয়ত বা গত ছয় বছরে গভীর অন্তরঙ্গতার ফলে চিঠির ভাষায় ও প্রকাশে এমন রূপান্তর ঘটেছে। রাণু যেন ক্রমেই কবির একান্ত নিকট আপনজনে পরিণত হয়েছে। যে রঙ্গ রসিকতা পরিহাস কৌতুক ১৯১৭-'১৮-'১৯-এ করা যেত না তা যেন কিছুটা অনাবৃত ১৯২৩-২৪-এ লেখা কবির চিঠিতে। রাণুর প্রেম রাণুর ভালোবাসা রাণুর সান্নিধ্য রাণুর যত্ন রাণুর আদর রাণুর আবেগ এবং সর্বোপরি রাণুর মোহিনী রূপ কি কোনও সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল? একজন সপ্তদশীর সঙ্গে 'পূর্ণ যৌবন'-এর একজন 'সাতাশ' বছরের যুবকের সমতলে পাহাড়ে এবং পত্রসাগরে এই যে নৈকট্য তা কি সেই 'যুবক'-যুবতীকে পরস্পরের প্রতি অনুরাগে আকর্ষণে আবেগে বিচলিত করতে পারে না? একদিকে প্রকৃতির হাতছানি আর-একদিকে কর্তব্যের আহ্বান। কিন্তু জীবনের কর্তব্যকর্ম থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত না হয়েও কি ক্ষণকালের জন্যে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া যায় না?

রাণু তার পত্রের মাধ্যমেই কবির সঙ্গে প্রথম আলাপ করেছিল। আজ সেই রাণুই কি কাদম্বরী কাব্যের পত্রলেখা হয়ে কবির সম্মুখে উপস্থিত? রাণু ও রবীন্দ্রের সম্পর্কের মধ্যে চন্দ্রাপীড় ও পত্রলেখার সম্পর্কের ছবিটা ভেসে ওঠে। কাব্যের উপেক্ষিতা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, 'পত্রলেখা পত্নী নহে, প্রণয়িনীও নহে, কিংকরীও নহে, পুরুষের সহচরী।' রবীন্দ্রনাথেরই জিজ্ঞাসা, 'এই প্রকার অপরূপ সখীত্ব দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি বালুতটের মতো— কেমন করিয়া তাহা রক্ষা পায়। নবযৌবন কুমার-কুমারীর মধ্যে অনাদিকালের যে চিরন্তন প্রবল আকর্ষণ আছে তাহা দুই দিক হইতেই এই সংকীর্ণ বাধাটুকুকে ক্ষয় করিয়া লঙ্ঘন করে

~ journeybybook.com ~

না কেন?...অথচ সখীত্বের মধ্যে লেশমাত্র অন্তরাল ছিল না।...এই সম্বন্ধটি অপূর্ব সমধুর, কিন্তু ইহার মধ্যে নারী-অধিকারের পূর্ণতা নাই।'

যে প্রশ্ন বাণভট্টের পত্রলেখার প্রতি রবীন্দ্রনাথের, সেই প্রশ্ন কি রবীন্দ্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পত্রলেখা রূপসী রাণুও উচ্চারণ করতে পারে না? সে প্রশ্নে আমাদের মনও কি কিঞ্চিৎ বিচলিত বা বিহ্বল হয় না? কবির জীবনে রাণুর এই যে ক্রমবর্ধমান নৈকট্য তা কি কবির মনকেও কিছুমাত্র বিচলিত করে না? অন্তত রাণুর দিক থেকে যে গভীর আকুলতা আবেগ ভালোবাসা, তাকে কি কবি অস্বীকার করতে পারেন? আজ কাব্যের উপেক্ষিতা প্রবন্ধ থেকে দু'টি ছত্র তুলে (পুরুষের হৃদয়ের পার্শ্বে সে জাগিয়া রহিল, কিন্তু ভিতরে পদার্পণ করিল না। কোনও দিন একটা অসতর্ক বসন্তের বাতাসে এই সখীত্বপর্দার একটা প্রান্তও উড়িয়া পড়িল না।) যদি কেউ রাণু-রবীন্দ্রের সম্পর্ক প্রসঙ্গে এমন প্রশ্ন করে, তাকে কে বাধা দেবে?

পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের কে, সে-প্রশ্ন তো রবীন্দ্রনাথেরই ছিল। কবির প্রশ্নের মতো রাণুও একদিন রবীন্দ্রনাথকে সুস্পষ্টভাবে প্রশ্ন করে বলেছে—আমি আপনার কে?

রাণুর এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা প্রয়োজন।

১৯২৪

কাশী থেকে ফিরে কবি শান্তিনিকেতন থেকে ৩০ জানুয়ারি রাণুকে যে চিঠি দেন (প্রসঙ্গ পেয়ারা, 'এ তো দেখি আমার রাণুরই মতো') তার উত্তরে রাণু কী লিখেছিলেন আমাদের জানা নেই। কিন্তু তার মাত্র চার দিন পরে কলকাতা থেকে রাণুকে লেখা কবির একটি বড় চিঠি পাই, যাতে রবীন্দ্রনাথ এবং রাণুর দীর্ঘ দিন ধরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা এই সম্পর্কটি নিয়ে কবি আলোচনা করেছেন। উভয়ের এই সম্পর্ক দুটি মানুষের কতখানি নিকটবর্তী ছিল তা আমরা কোনও প্রমাণ

~ journeybybook.com ~

দিয়ে বলতে পারব না ; কিন্তু সম্পর্কটা উভয়ের দিক থেকে এতটাই গভীর এবং নিবিড় ছিল যে তা তাকে এককথায় কেউ সহজে পাশ কাটিয়েও যেতে পারে না। সম্পর্কটা দু'টি মানুষের মধ্যে হলেও উভয়ের চারপাশের মানুষজনেরাও তো সেই সম্পর্কের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে সম্পর্কিত থাকেন। তাই সম্পর্ক গড়াও যেমন একদিনে হয় না, তেমনি গড়ে ওঠা সম্পর্কের বন্ধন থেকে ইচ্ছেমতো বা খুশিমতো ছেড়ে বেরিয়ে আসাও সবসময় কিন্তু সহজ হয় না। একজন ছাড়তে চাইলেও আর একজন ছাড়তে দিতে নাও চাইতে পারে। এমন সমস্যা রবীন্দ্রনাথ ও রাণুর মধ্যেই ঘটেছিল।

দীর্ঘকাল রাণু-রবীন্দ্র সম্পর্কে কোনও সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। রাণুর মন-প্রাণ-ভালোবাসা সবটুকুই ছিল রবীন্দ্রনাথ নামক মানুষটাকে ঘিরে। সেইভাবেই রাণু কখন একাদশী থেকে সপ্তদশীতে পৌঁছে যায়। আর বছরের পর বছর রাণুর প্রতি কবির ভালোবাসা যে গভীরতর হয়েছে সে-কথা তো কবির ভাষাতেই 'জগদ্বিখ্যাত'। এরই মধ্যে রূপসী রাণুর অনুরাগী গুণগ্রাহী ও ভক্তমণ্ডলীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। রাণুর গৌরব শুধু তার রূপে বা অভিনয় দক্ষতাতেই নয়, তার সবচেয়ে বড় খ্যাতি নিঃসংশয়ে— সে রবীন্দ্রস্নেহধন্যা। সপ্তদশী সুন্দরী তাঁর ভক্তজনেদের প্রতিও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনুকম্পা বিতরণ করতে শুরু করেছেন। সপ্তদশী রাণুর একথা জানা ছিল যে যতই দেহে মনে তিনি 'সাতাশ' হোন, বাষট্টি বছরের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হতে পারে না। তাই এই কবিপ্রণয়িনী সংকল্প করে নিয়েছিলেন— তিনি নিজেও কখনও কাউকেই বিবাহ করবেন না। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি যা পেয়েছেন তার মূল্য তাঁর কাছে অপরিসীম ; কিন্তু সত্যিকারের যাঁরা 'সাতাশ' বছর বয়সি অনুরাগিজন তাঁদের প্রতি সুন্দরী কৃপাপ্রদর্শনে অত্যধিক কৃপণও থাকেননি।

~ journeybybook.com ~

শিলং থেকে ফিরে বিসর্জনের অভিনয়ে চূড়ান্ত সাফল্যের পর রাণু সকলের কাছেই অনেকটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। রাণুও এই সমাদরকে সাদরেই বরণ করে নিচ্ছিলেন। এই সময়েই অনুরক্ত পূর্ণেন্দ্রনাথের (ডাকনাম বুড়ো) সঙ্গে রাণুর একটা ছোটখাট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কবি প্রথম দিকে সব কিছুই লঘু এবং হালকাভাবে নিচ্ছিলেন ; কিন্তু এইসব ব্যাপার ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে এবং শেষে কবির নামও এই জটিলতার মধ্যে এসে পড়ে। রাণুর কি মনে হয়েছে শিলং-এর রবীন্দ্রনাথ, বিসর্জনের জয়সিংহ-রবীন্দ্রনাথ আর কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে আসা রবীন্দ্রনাথ এক নয়? কাশীতে কি রবীন্দ্রনাথ রাণুর কাছ থেকে একটু দূরে সরে থাকতে চেয়েছেন? শিলং-এর রবীন্দ্রনাথ আর কাশীর রবীন্দ্রনাথ কি দুই রবীন্দ্রনাথ? আঠারো বছরের রাণুর সেটুকু বোঝার মতো নিশ্চয়ই ক্ষমতা আছে। এবং সেজন্যেই সে অপ্রত্যাশিত বেদনা ও দুঃখ পেয়ে কবিকে 'নিষ্ঠুর কঠিন' বলে সবেদন অনুযোগ করেছে, অভিমান করেছে। রাণু-রবীন্দ্রের দীর্ঘকালের সম্পর্কে এইখানেই বুঝি একটা প্রথম বাঁক লক্ষ করা যায়।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪। কলকাতা থেকে রাণুকে কবি লিখলেন, 'রাণু, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি মনকে শান্ত করো। তোমার জন্যেই আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম। যে একটা জটিল জালের মধ্যে তুমি জড়িয়ে পড়েছিলে, তার জন্যে অনেক পরিমাণে আমিই দায়ি বলে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম। তোমার এই প্রথম বয়েস, এই সময়ে তোমার পড়াশুনো তোমার নিশ্চিন্ত হাসি উল্লাসের মাঝখানে এই সমস্ত উপদ্রব এনে তোমার সমস্ত জীবনকে এমন করে যে একটা ঘূর্ণিপাক খাইয়ে দেওয়া গেল সেটাতেই আমাকে দুঃখ দিয়েছে। তোমার উপর আমি কখনও এমন রাগ করতেই পারিনে যাতে তুমি স্থায়ীভাবে ব্যথা পেতে পারো। আমার স্নেহ তুমি হারিয়েছ কল্পনা করে যে কষ্ট পাচ্ছ তার কোনও মূল্য নেই। আমার যে-স্নেহ তুমি এমন

~ journeybybook.com ~

করে টেনে নিয়েছ সে আমি কোনও দিন কিছুতেই প্রত্যাহরণ করতে পারিনে। আমার স্নেহে যদি তোমার কোনও সান্ত্বনা থাকে, তাতে যদি তোমার হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে পারে, তাহলে সে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে ভোগ করো— তার দ্বারা তুমি বল পাও, সুখ পাও, কল্যাণ পাও, এই আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। আমার কক্ষপথে কোথা থেকে কেমন করে তুমি একটি প্রাণের জ্যোতিষ্ক এসে পড়েছ, তোমার সংসারের অভিজ্ঞতা কিছুই নেই, তোমার মন কাঁচা, আমি কি তোমাকে রূঢ়ভাবে আঘাত করতে পারি? তোমার উপরে আমার বেদনাপূর্ণ স্নেহ সর্বদা আপনি গিয়ে বিকীর্ণ হচ্ছে। আমার জীবনের দায়িত্ব, কখন্ আমার অগোচরে, এবং জানিনে কার প্রেরণায় ক্রমশই বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠছে— তার সমস্তটার সঙ্গে তোমার সম্পূর্ণ যোগ হওয়া সম্ভবপর নয়, তুমি ছাড়া আর কারও যে যোগ আছে তাও নয়— ওইখানে বিধাতা আমাকে অনেকটা পরিমাণে একলা করে দিয়েছেন। কিন্তু তুমি হঠাৎ এসে আমার সেই জীবনের জটিলতার একান্তে যে-বাসাটি বেঁধেছ, তাতে আমাকে আনন্দ দিয়েছ। হয়ত আমার কর্মে আমার সাধনায় এই জিনিসটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই আমার বিধাতা এই রসটুকু আমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন। আমার অনেক সহযোগী আছে যারা আমার কর্মে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে, তুমি তা করো না ; আমার জীবনের লক্ষ্যের দিকে তুমি হয়ত আমাকে সম্পূর্ণ বুঝতে এখনও পার না। কিন্তু জীবনের সেই লক্ষ্য যেখানেই থাক্ না, তুমি তোমার সরল প্রাণের অর্ঘ্যের দ্বারা আমার সেই জীবনকেই যা দিয়েছ তুমি কি মনে করো সে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক? তা যদি হত তাহলে তুমি কখনওই আমার কাছে আসতে পেতে না। কেননা আমি জানি আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে দিয়ে তাঁর একটা কোনও বিশেষ কাজ আদায় করবেন বলেই শিশুকাল থেকে আমার জীবনকে নানা অবস্থার মধ্যে

~ journeybybook.com ~

দিয়ে গড়ে নিচ্চেন। তাঁরি ডাকে আজ হঠাৎ তুমিও আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছ। কীরকম অভাবনীয় রূপে এসেছ সেকথা মনে করলে আশ্চর্য হতে হয় না কি? আমার পক্ষে তুমি যে বন্ধন হয়ে আসবে এ কিছুতে হতেই পারে না, কেননা মুক্ত না থাকলে, আমার মধ্যে যা সবচেয়ে বড় তাকে আমি ব্যক্ত করতে পারিনে, আর তা না করতে পারা আমার পক্ষে এক রকম মৃত্যুরই মতো। সেই জন্যেই তুমি আমার জীবনের প্রাঙ্গণে ফুল-ফোটা লতার মতই এসেছ, বেড়ার মতো আসনি। তোমার সেই ফুলের গন্ধ আমার মনে লেগেছে। তারই আনন্দ আমার কাজের অনেক ক্লান্তি দূর করে, এবং অবকাশের মধ্যে গানের সুর লাগায়। আমি তোমাকে উপেক্ষা করে আমার জীবনের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি এই কথা কল্পনা করে তুমি নিজেকে কখনও অনর্থক ক্লিষ্ট করো না।'

সাত দিন পরে আবার কবির চিঠি রাণুকে। আবারও কৌতুক, রাণুর সঙ্গে, এবং রাণুকে নিয়ে।

কবি লিখছেন, 'Elmhirst যখন কাশী দিগ্বিজয় করে আশ্রমে ফিরে এলেন তখন ভানুদাদা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সখে, রাণু নামধারিণী কাশীবাসিনী বালিকাকে কেমন দেখলে আমার কাছে প্রকাশ করে বলো।" সাহেব বললেন, "বন্ধু She looked very happy." ভানুদাদা স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবতে লাগল, হঠাৎ এত happiness-এর কারণ কী ঘটল? দীর্ঘকাল ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "হে প্রিয়দর্শন, তাকে কি কিছু কৃশ দেখলে? মুখ কি তার পাণ্ডুবর্ণ? সত্য বলো, আমার কাছে গোপন কোরো না।" সাহেব বললে, "উদ্বিগ্ন হ'য়ো না, বন্ধু, বরবর্ণিনীকে যেমন হৃষ্ট দেখলুম তেমনি পুষ্টও দেখা গেল, তবে কিনা তার মুখের বর্ণে যে পাণ্ডুরতার আভাস পাওয়া গেল সেটা নিশ্চয়ই কোনও প্রসাধন সামগ্রীর গুণে।" ভানুদাদা দীর্ঘতর কাল চিন্তা করে ও দীর্ঘতর নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলে, "প্রিয় সুহৃৎ, সেই বালিকার প্রসাধনের

~ journeybybook.com ~

উৎসাহ আজকাল কি কিছুমাত্র কমেনি?" সাহেব বললেন, "ভো বন্ধো, শুনে খুশি হবে, আমি যতক্ষণ ছিলাম, তার প্রসাধনপটুত্বের বৃদ্ধি বই হ্রাস তো দেখিনি।" ভানুদাদা ম্লানমুখে পুনশ্চ প্রশ্ন করলে, "আকাশের চাঁদকে দেখে তার কি কোনও প্রকার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে দেখেছ?" সাহেব বললে, "হে ধীমন, তার চাঞ্চল্যের জন্যে আকাশের চাঁদের কোনও অপেক্ষা থাকেনি— নিকটবর্তী কারণই যথেষ্ট।" তারপরে ভানুদাদা তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহ বোধ করলে না।'

ওপরের চিঠি ১১ ফেব্রুয়ারির। শান্তিনিকেতন থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি আবার কবির চিঠি রাণুকে। বারোশো শব্দের দীর্ঘ চিঠি। 'বড় চিঠি লিখলে কেউ একজন খুশি হবে'— তাই এমনতর বৃহৎ চিঠি কবির রাণুকে। 'চিঠি' নিয়েই এ-চিঠি।

২৪ ফেব্রুয়ারি। কলকাতা থেকে। আবারও দীর্ঘ চিঠি। রাণুকে। চিঠির প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ মজা ও কৌতুক। চিঠির শেষ এক-তৃতীয়াংশ গুরুতর কয়েকটি কথা। চিঠির শেষ প্যারাগ্রাফে কবি রাণুকে বলছেন, 'এতক্ষণ তোমার সঙ্গে হাসি-তামাশা করেছি এখন একটু গম্ভীর হতে হবে। ইচ্ছে করে না গম্ভীর হয়ে তোমার মনকে নাড়া দিতে— কিন্তু অত্যন্ত আবশ্যক বলেই তোমাকে বলছি। তোমার একটা কথা বিশেষ জানা উচিত যে তোমার সম্বন্ধে বুড়োদের [পূর্ণেন্দ্রনাথ ঠাকুর] বাড়িতে কুশ্রীরকম অপমানজনক কথাবার্তা চলছে। এমন একটা অবস্থায় এসে ঠেকেছে যে তোমার সঙ্গে বুড়োর বিবাহ কোনওমতেই সম্ভবপর নয়। অথচ তুমি এখনও যদি বুড়োকে চিঠি লেখো তাহলে কেবল যে তোমারই আত্মসম্মানের হানি হবে তা নয় তোমার বাপ মায়ের প্রতি অবমাননা টেনে আনবে। আমি গোপনে বলছি তোমার সম্বন্ধে তোমার বাবাকে অপমান করতে বুড়োর বাড়ি থেকে আর একটু হলে চেষ্টা করা হচ্ছিল এ সত্ত্বেও যদি তুমি বুড়োকে চিঠি লিখতে না ছাড়ো তাহলে তাকেও তুমি বিপদে ফেলবে, নিজেদেরও অপমানিত করবে, আর তা

~ journeybybook.com ~

ছাড়া এতে আমারও খুব লাঞ্ছনা হবে। আমার সম্বন্ধেও ওদের বাড়িতে আলোচনা চলছে তুমি যদি এখনও আত্মসংবরণ করতে না পার তাহলে আমার পক্ষেও গুরুতর লজ্জার কারণ হবে। অবশ্য জানি, আমি না বুঝে গোড়াতে প্রশ্রয় দিয়েছি—সেটা আমার গভীর বেদনা ও অনুশোচনার বিষয় হয়ে রয়েছে। অনেকটা পরিমাণে আমারই উৎসাহে যখন বুড়োর প্রতি তোমার হৃদয় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন হঠাৎ সেদিক থেকে তোমার ভালোবাসা প্রত্যাহরণ করতে বললেই যে অমনি তখনি সেটা সুসাধ্য হবে এটা আশা করাই যায় না। কিন্তু ভালোবাসারও তো একটা আত্মসম্মান এবং একটা দায়িত্ব আছে। বুড়োকে যখন তুমি ভালোবাসো তখন বুড়োর কল্যাণের কথাও তো তোমার ভাবা উচিত।'

একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। যে ষাট-ঊর্ধ্ব 'দেখতে নারদ মুনির মতো—মস্ত বড় পাকা দাড়ি' তার বয়স 'সাতাশ', আর যে-তরুণ সত্যিই হয়ত 'সাতাশ', তারই নাম কিনা 'বুড়ো'। সাহেব-সুবোরা লাইনে থাকলেও সমস্যা দেখা যাচ্ছে মূলত দুই বুড়োকে নিয়ে। শরীরে 'সাতাশ' রাণুকে বিবাহ করতে বদ্ধপরিকর ; আর অন্তরে 'সাতাশ'-এর ঘোরতর আপত্তি 'বুড়ো'র সঙ্গে রাণুর বিবাহ প্রস্তাবে। রাণুর যে বয়স তাতে পূর্ণেন্দ্রনাথের প্রতি রাণুর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার তীব্রতম গভীর আকর্ষণ এবং মুগ্ধতা ও আবেগ তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। রাণু যে-কাউকে পরিত্যাগ করতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সে কিছুতেই তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। কবির দুর্লভ প্রীতি-ভালোবাসা সান্নিধ্য থেকে রাণু কিছুতেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও কিছুতেই সম্মত নন বুড়োকে রাণু গ্রহণ করুক।

দেখতে দেখতে রাণুর বয়স তো কম হল না। আঠারো। সেই দিনের পক্ষে অনূঢ়ার আঠারো বছর বয়স কম নয়। বঙ্কিমের উপন্যাসে একটা

~ journeybybook.com ~

এরকম বাক্য আছে : যাহাকে বিবাহ করিতে পারা যায় না তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে। প্রসঙ্গটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক ; তবে রাণুর বিবাহের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ এই মুহূর্তে যথেষ্টই উদ্যোগী। রাণুর একটি ভালো পাত্র খোঁজার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তৎপর। রাণু যাতে অপাত্রে না পড়ে সে-ব্যাপারে কবি সজাগ এবং সতর্ক।

রাণুর পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বিবাহ করা সম্ভব নয়— এটা যেমন সত্য, তেমনই সত্য হল, রাণু অপর কাউকেও তার জীবনসঙ্গীরূপে বরণ করে নিতে চায় না। কবির প্রতি রাণুর যে আন্তরিক তীব্র ভালোবাসা— সেই ভালোবাসার গভীরতা ও সত্য কবি ঠিক অনুভব করতে পারছেন না বলেই রাণু অতিশয় বেদনাহত ও কাতর। ৭ মার্চ রাণুকে কবি লিখছেন, 'গভীর দুঃখের তপস্যায় নিজের পরম পরিপূর্ণতাকে স্পর্শ করা যায়। এই দুঃখের আঘাত তোমাকে চিরদিনের মতো উদ্বোধিত করুক, জীবনের উপরিতলের চঞ্চল ফেনিলতার ভিতর দিকে নিজের মধ্যেকার যা শ্রেষ্ঠ তাকেই লাভ করো। অনেকদিন আমি এই ভেবেছি, আমি ইচ্ছে করেছি, আমি তোমাকে আর কিছু দেবার অবকাশ যদি না পাই তবে যেন তোমার গভীরতম আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যেতে পারি।'

ক্ষিতীশপ্রসাদ চাটুজ্যের সঙ্গে সুরেন ঠাকুরের মেয়ে মঞ্জুশ্রীর বিয়ে হয় ১০ মার্চ ১৯২৪। ১১ মার্চ তারিখে রবীন্দ্রনাথ রাণুকে এই বিবাহের সংবাদ দেন ; এবং বিবাহের মাধ্যমে কীভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন তৈরি হয় তার বিশ্লেষণ করেন।

নানা কারণে রাণু বিবাহ করতে অনিচ্ছুক ; রবীন্দ্রনাথ চান রাণু বিয়ে করে সংসারী হোক। রাণুকে বিবাহে প্ররোচিত করতে কবির এই পত্র— 'মোটের উপর এ কথা বলা যায় যে, দু'জন মানুষের যদি অত্যন্ত বেশি পার্থক্য না থাকে তাহলে ক্রমে ক্রমে সংসারবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনও পাকা হয়ে উঠতে থাকে। যখন পরস্পরের সুখ দুঃখ

~ journeybybook.com ~

ও সাংসারিক ক্ষতিলাভকে একান্তভাবে অন্তরঙ্গভাবে আপন করে নিতেই হয় তখন তারই যোগসূত্র দু'জনকে ধীরে ধীরে এক করে আনে। জীবনের সম্মিলন থেকেই হৃদয়ের সম্মিলন হতে থাকে। দু'জনের সম্মিলিত জীবনের ঐক্যের ভিত্তির উপরেই সংসারের সৃষ্টি হয়। এই সংসারটিই হচ্ছে মেয়েদের সৃষ্টিক্ষেত্র, এইখানেই তাদের সমস্ত শক্তি আপনাকে কল্যাণের মধ্যে সুন্দরের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে বলে এইখানে যে-মানুষকে মেয়ে আপনার একমাত্র অংশীরূপে পায় তার মূল্য আপনিই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে।'

একদিকে বিবাহে অনিচ্ছুক রাণুকে কবি সংসারধর্ম পালনে উৎসাহিত করে পত্র লিখছেন, আর একদিকে রাণুর বাবাকে তাঁড়াহুড়ো করে রাণুর বিবাহ না দেবার উপদেশ দিচ্ছেন। রাণুকে নিয়ে, বোঝা যায়, কবি কিঞ্চিৎ অস্থির, কিছুটা দিশাহারা। যে মার্চে কবি রাণুকে লিখছেন, 'সংসারটিই হচ্ছে মেয়েদের সৃষ্টিক্ষেত্র', সেই মার্চেই রাণুর বাবাকে লিখছেন, 'শীঘ্রই রাণুর বিবাহ দিয়ে সমস্যা সমাধানের যে চিন্তা করছ আমার কাছে সেটা ভালো বলে তো ঠেকচে না, তাতে সামাজিক সমস্যার মীমাংসা হতেও পারে, কিন্তু রাণুর নিজের পক্ষে সেটা সুখকর কিংবা কল্যাণকর হবে কি না সেটাই বিশেষ করে ভাববার কথা। দুঃখ পাবার শক্তি ওর এতো তীব্র যে ও যদি অস্থানে গিয়ে পড়ে তাহলে ভিতরে ভিতরে ও নিজেকে দগ্ধ করে মারবে। যতক্ষণ খুব নিশ্চিত করে না বুঝবে ততক্ষণ উপস্থিত সংকট কোনও মতে এড়াবার জন্য একটা ঠেকা দেবার চেষ্টা ক'রো না। আমার বিশ্বাস, রাণুর মা রাণুর নিজের পক্ষের কথাটা তোমার চেয়ে ঠিক বুঝতে পারবেন। তিনি এ সম্বন্ধে কী ভাবছেন আমি জানতে ইচ্ছা করি। সুসঙ্গের সুহৃদ [সুহৃদচন্দ্র সিংহ, ময়মনসিং জেলার সুসঙ্গের রাজপরিবারের সন্তান] রাণুর কথা আমার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে। আমি তাকে উৎসাহ

~ journeybybook.com ~

দিইনি। কেননা কি হলে রাণুর পক্ষে ঠিকটি হয় তা নিশ্চিত না জেনে কতকগুলো কথা জমিয়ে তুলতে আমার আর সাহস হয় না। আমার তো মনে হয় আরও কিছুদিন পড়াশোনার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে বর্তমান এই সমস্ত জঞ্জালের চিহ্ন মুছে ফেলা সর্বপ্রথমে দরকার। তারপরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ শান্ত হলে ওর সম্বন্ধে সুব্যবস্থা সহজ হবে। এখন ওর মনে আলোড়ন হচ্ছে, সেটা আর কিছুদিন পরে নিশ্চয়ই অনেকটা পরিমাণ ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। আমার যদি সময় থাকত রাণুর সঙ্গে আর রাণুর মার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কয়ে ভিতরকার অবস্থাটা ভালো করে বোঝবার এবং রাণুকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতুম।'

এবার চীনের আমন্ত্রণে কবির সে-দেশে যাত্রা ২১ মার্চ। যে-দেশ থেকেই আমন্ত্রণ আসুক, যেখানেই কবি যান, তাঁর যাওয়া তো নয় যাওয়া। তিনি জানেন, যেখানেই যান, 'দেশে বিদেশে একটা বাণী বহন করে নিয়ে যেতে হবে'— তাঁর উপরে বিধাতার আছে এমনইতর 'হুকুম'। তাই তাঁর চীনদেশে যাওয়া শুধুই দেশভ্রমণমাত্রই নয়— তারও চেয়ে অনেক বড় কিছু।

কবি যাতে চীনভ্রমণে না যান, চীনের আমন্ত্রণ রক্ষা না করে রাণুর আমন্ত্রণ রক্ষা করেন, রাণুর আমন্ত্রণে রাণুরই কাছে থাকেন— এমন আব্দার রাণুর দিক থেকে কবির কাছে এসেছিল। রাণুর হয়ত মনের মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস একটা প্রত্যয় জন্মেছিল যে রাণুর কথা কবি এড়াতে পারবেন না। শিলং পাহাড়ে দেড় মাস কবির সঙ্গে ভ্রমণ, বিসর্জন নাটকের মহড়াপর্বে কবির যে নৈকট্য লাভ এবং দিনের পর দিন উভয়ের অসংখ্য পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে যে গভীর অন্তরঙ্গতায় ভালোবাসার একটি একান্ত আপনার নিজস্ব ভুবন নির্মিত হয়েছিল— সেই ভুবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে দর্পিত রাণুর বুঝি মনে ধারণা হয়েছিল কবি

~ journeybybook.com ~

তাঁর রাণুর আব্দার রাণুর অনুনয় এড়াতে পারবেন না। রাণুর ভালোবাসাকে কবি কখনো অস্বীকার করেননি অসম্মানও করেননি ; কিন্তু নারীর সেই ভালোবাসা সেই প্রীতি সেই প্রেম কবিকে কখনও কোনও সীমারেখা-গণ্ডিতে বদ্ধ করেও রাখতে পারে না। প্রকৃত প্রেম মানুষকে শৃঙ্খলবদ্ধ করে না, প্রকৃত প্রেম মানুষকে মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করে, মানুষকে তার কর্তব্যকর্মের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে প্রেরণা দেয়। সুতরাং রাণু যদি কবির সঙ্গে তার প্রেম প্রীতি বা সম্পর্কের দাবিতে কবিকে বলে— 'তুমি থাকো, যেও না'— কবি সেই বদ্ধ-প্রেমে সাড়া দিতে পারেন না। কবি বলছেন— 'আমি বাণীর বাহন— কাজেই এই বাণী ছড়িয়ে দেওয়াই আমার কাজ— আমাকে চুপ করে থাকতে দেবে না, আমি একটা জায়গায় বসে থাকতেও পারব না। কাজেই চীন আমাকে ডাক দিলে তখন আমাকে চীনে যেতেই হবে।'

কবি রাণুকে ১৩ মার্চ চীনে যাবার এক সপ্তাহ আগে শান্তিনিকেতন থেকে লিখছেন, 'যাকে চীন ডেকেছে, আমার মধ্যে তাকে দেখে তুমি খুশি হও, রাণু। চীন আমাকে না ডাকলে বেশ হত এমন কথা তুমি মনে মনেও বোলো না। আমাকে খর্ব করে তাতে তো তোমার লাভ নেই— বরঞ্চ তাতে তোমার ভানুদাদার অনেকখানিই বাদ গেল বলে তোমার সেটা লোকসান। আমাকে পৃথিবীতে কেবল একমাত্র যদি তুমিই পেতে তাহলে তো তুমি ঠকতে— কেননা পৃথিবীর সেই একঘরে হতভাগার মূল্যই বা কী। তোমার কাছে থাকার দ্বারাই তুমি যে আমাকে বেশি পাবে সে তোমার ভুল। আমাকে জগতের লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পাও যদি তাহলেই তুমি সবচেয়ে বেশি পাবে।...তুমি যদি ভানুদাদাকে ভালোবাসো তাহলে তার এই সার্থকতাকে তুমি অভিনন্দন করো— যাতে সে সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সংকুচিত হয়ে, ক্ষুদ্রতার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে, অবসন্ন হয়ে না থাকে সেই কামনা করো। যে কর্ম সত্যই আমার, সেই কর্মেই আমার মুক্তি— সেই মুক্তির মধ্যে যখন আমি

~ journeybybook.com ~

নিজেকে দেখি তখনই আমার জীবনের আকাশ প্রসন্ন হয়ে ওঠে— আমার জীবনের সেই প্রসন্নতায় তোমার চিত্ত প্রসন্ন হোক— আমার সঙ্গ পাওয়ার চেয়েও তাতে তুমি আমাকে অনেক বেশি করে পাও এই আমি কামনা করি।' শেষের কবিতার সেই লাইন দুটি মনে পড়ে—

'মোর লাগি করিয়ো না শোক
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।'

অথচ এই কবিই কতবার রাণুর কাছে যাবার জন্যে, কিংবা রাণুকে যাতে কাছে পান সেজন্যে ব্যাকুলতা অনুভব করেছিলেন এবং তৎপর হয়েছিলেন।

সেই ১৯১৭-তে, সাত বছর আগে, রাণুর প্রথম চিঠিটি পেয়ে কবি উত্তরে লিখেছিলেন, 'তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুলব না— হয়ত তোমাদের বাড়িতে একদিন যাব— কিন্তু তার আগে তুমি যদি আর-কোনও বাড়িতে চলে যাও? সংসারে এই রকম করেই গল্প ঠিক জায়গায় সম্পূর্ণ হয় না।'

রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লেখা প্রথম চিঠিতেই একটি সম্ভাব্য 'গল্প'র কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সেই 'গল্প' যে একদিন বাস্তবেরই আলেখ্য হয়ে উঠবে সেকথা সেদিন কে ভেবেছিল? শুধু কি রাণুরই আর কোনও বাড়িতে চলে যাওয়া ; কখনো কি কবিই নানা কারণে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির আবশ্যকতা অনুভব করবেন? নৈকট্যের ভিত্তিভূমিতে সৌধ নির্মাণে কবিই কি শেষ পর্যন্ত বাধা দেবেন? রাণুকে 'আর-কোনও বাড়িতে' চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বয়ং কবিই কি হবেন সবচেয়ে বড় উদ্যোগী?

রাণুর আকাঙ্ক্ষা কবিকে একান্তভাবে কাছে পাওয়া ; আর কবি এদিকে চীনদেশে পাড়ি দেবার পূর্বেই রাণুর বিয়ের ঘটকালীটা সেরে ফেলতে চান।

~ journeybybook.com ~

রাণুকে চিঠি লেখার দু'দিন পরেই কাশীতে রাণুর মা সরযূবালাকে কবি লিখলেন, 'আমি চীনে রওনা হবার পূর্বে কিছু একটা মীমাংসার মত হয়ে গেলে কতকটা মাথা ঠাণ্ডা করে কয়েক মাসের মতো দৌড় দিতে পারি। সুসঙ্গের সুহৃদের [সুসঙ্গের জমিদারপুত্র সুহৃদচন্দ্র সিংহ] কথা ইতিপূর্বেই তোমাকে বলেছি। বেশ বুঝতে পারছি তার মনটা রাণুর জন্যে ব্যাকুল হয়েছে কিন্তু ওর মধ্যে খুব একটা ভদ্রোচিত সংযম আছে বলে ধৈর্য ধরে আছে। কেবল আমাকে দৈবাৎ দুয়েকটা বেফাঁস কথায় ধরা দিয়ে ফেলে। তার চিঠি তোমাকে পাঠাই। ছেলেটি সকলদিকে ভালো তার সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভালোকেই যে সবসময়ে ভালো লাগে এমন কোনও বাঁধা নিয়ম নেই। পৃথিবীতে সত্যকার ভালোবাসা দুর্লভ সে কথাও ভেবে দেখা চাই। ও রাণুকে ভালোবাসবে সুতরাং ওকে ভুল বুঝবে না— ওর মধ্যে যে দুর্দমতা আছে তার সম্বন্ধেও অসহিষ্ণু হবে না। তা ছাড়া সুহৃদ আমাকে সত্যই শ্রদ্ধা করে সুতরাং আমার সম্বন্ধে রাণুকে বোধ করি বেদনা দেবে না। মুস্কিল এই যে রাণুর জীবনের মাঝখানে কেমন করে আমি একটা কেন্দ্র দখল করে বসে আছি, সুতরাং ওর যেখানেই গতি হোক আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলবে না। তাতে সমস্ত ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠেছে। সেই জটা যদি ছাড়ানো সম্ভব হত তাহলে সবই সোজা হত। কিন্তু বেদনা পেতে ও যেরকম আসাধারণ রকম পটু তাতে ওকে কাঁদাতে আমার মন সরে না। ওকে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা দেবার পথ আমার হাতে নেই— তবে কিনা আমার অন্তরের স্নেহ পাবার পক্ষে ওর কোনও ব্যাঘাত না হয় এই সম্ভাবনার কথাই আমি আশা করতে পারি। রাণুর জন্যে আমার মনে খুব একটা উৎকণ্ঠা আছে— সেইজন্যে একটি যথার্থ ভদ্রলোকের হাতে ওকে দিতে পারলে আমি সুখী হই।'

২১ মার্চ। আউটরাম ঘাট থেকে কবিকে নিয়ে জাহাজ ছাড়ল। কবির

~ journeybybook.com ~

সঙ্গে এলমহার্স্ট— কবির ভ্রমণ-সেক্রেটারি ; তাছাড়া সঙ্গী মিস গ্রিন, নন্দলাল, ক্ষিতিমোহন ও কালিদাস নাগ।

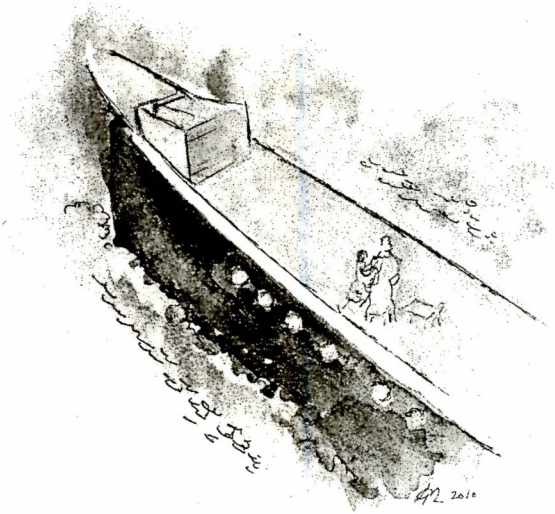

গঙ্গার ঘাটে কবিকে যাঁরা বিদায় জানাতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাণুর বাবা ফণিভূষণ অধিকারীও ছিলেন। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আর-একজনকেও কবির চোখে পড়ল— তিনি শ্রীমান্ বুড়ো পূর্ণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২২ মার্চ, চলন্ত জাহাজে বসে কবি লিখলেন, 'কাল সকালবেলায় গঙ্গার ঘাটে জাহাজে উঠলুম। তোমার বাবা ছিলেন আরও অনেক লোক আমাকে বিদায় করবার জন্যে ভিড় করেছিলেন। তার মধ্যে কিরণকে [পরিচয় জানা যায়নি] অবলম্বন করে বুড়োও এসেছিল। বোধহয় তার বাবা [প্রফুল্লনাথ ঠাকুর] তাকে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিল।'

~ journeybybook.com ~

যাবার মুখে বুড়োকে দেখে নিশ্চয় কবির ভালো লাগেনি। বুড়ো যে ক্রমেই একটা গণ্ডগোল বাঁধাবে কবি তা মনে মনে অনুমান করছিলেন।

ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী বহন করে কবি চলেছেন সুদূর চীন দেশে ; এদিকে রাণু-বুড়ো-সুহৃদ এদের নিয়ে কবির মনের মধ্যে চিন্তার জটিলতা। একটা চিন্তা, রাণু যেন বুড়োর কাছে নিজেকে ধরা না দেয় ; দ্বিতীয় চিন্তা, সুহৃদদের সঙ্গে রাণুর বিয়েটা যেন পাকা হয় ; এবং তৃতীয়, রাণু এবং তাঁর নিজের সম্পর্ক। কাছে তো গিয়েইছিলেন, এখন কবি রাণুর কাছ থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে আসতে চাইছেন। উলটোদিকে রাণু তা আদৌ চাইছে না। কবির সঙ্গে রাণুর যে সম্পর্ক এতদিনে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে তা থেকে অষ্টাদশী রূপসী এতটুকুও সরতে চায় না। কবিকে সে ছাড়তে চায় না। যে যতই কবিকে ভালোবাসুক না কেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক মানুষটা একান্তভাবেই রাণুর একার। তেমনভাবেই সে চায়। আর রাণুর এই চাওয়াটা যে ঠিক নয় একথাটাই কবি বিশেষভাবে রাণুকে এখন বোঝাতে চাইছেন।

আর সেই কারণেই মার্চের শেষে রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতার কথা রাণুকে কবি লিখলেন পিনাঙের পথে এগিয়ে চলা জাহাজে বসে। কবির আসল বক্তব্য— সাতাশ ছাব্বিশ বা সত্যিকারের বাষট্টি যাই-ই হোক না কেন, শুধু যে তুমিই আমাকে পছন্দ করো তা-ই নয়— জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ ; তোমার মতো ছোটো ছোটো অন্যদেশের মেয়েরাও আমাকে যথেষ্ট পছন্দ করে, আদর করে— হুঁ। এই সত্যটাকে তুমি অস্বীকার করতে পারো না আর তাদের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধন থেকে আমাকে এককভাবে কেউ ছিনিয়ে নিতেও পারে না।

কবির চিঠি : 'রেঙ্গুনে কয়দিন খুবই ধুমধাম গোলমাল ইত্যাদি চলেছিল। আসবার আগের দিন একটি চীনের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। সে পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার ইচ্ছে বিশ্বভারতীতে গিয়ে অন্তত এক বছর থেকে আমার কাছে সাহিত্য অধ্যয়ন করে। এই অল্প সময়টুকুর

~ journeybybook.com ~

মধ্যে সে আমার সঙ্গে এতো ভাব করে নিলে যে আশ্চর্য হয়ে গেছি। ঘাটে এসে দেখি, সেখানে সে উপস্থিত। জাহাজ ছিল মাঝনদীতে কিছু দূরে। একটা ছোটো স্টিমারে সব যাত্রীদের সেখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা ছিল। মেয়েটিও সেই জাহাজে উঠে পড়ল। আমার হাত চেপে ধরে বললে, আপনি চলে যাচ্ছেন, আমার কষ্ট হচ্ছে,— ফিরে এসে যেন আপনাকে দেখতে পাই। যখন ছোটো জাহাজ আমাদের জাহাজে এসে পৌঁছল, আমি বললুম, এবার গুড বায়। সে আমার বুকের উপর এসে পড়ল— চারদিকে সব লোকজন, তার তাতে খেয়াল নেই, সবাই হাসতে লাগল। জাহাজে আমার ক্যাবিনে মুখ ধুয়ে যখন জিনিসপত্র গোছাচ্ছি সে তার একটি আত্মীয় পুরুষের সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত। এলমহার্স্টকে ডেকে বললে, তুমি কবিকে খুব যত্ন করো, দেখো এঁর শরীর যেন কিছুতে ক্লান্ত এবং অসুস্থ না হয়। এলমহার্স্ট বললে, আমি এতো বড় দায়িত্ব নিতে পারব না, আমার বদলে তুমি না হয় এসো। ও বললে আমার যদি যাবার কোনও সুবিধে থাকত আমি নিশ্চয় যেতুম, দেখতে আমি কত যত্ন করতুম। বলে দুই হাতে আমার হাত চেপে ধরে রইল। জাহাজ যখন ছাড়ে ছাড়ে তার আত্মীয় তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, আমার এ কী দশা! কেউ বা ভারতবর্ষে বলে, তুমি থাকো যেও না, কেউ বা বর্মায় বলে, তুমি থাকো যেও না, কেউ বা হয়ত চীন দেশেও বলবে। অথচ আমার যিনি কর্ণধার আমাকে এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে ভাসিয়ে নিয়েই চলেছেন, কোথাও আর থামতে দিলেন না—।'

রাণু কবিকে দিয়ে বিদেশ যাবার আগে বুঝি এমন একটা শপথ করিয়ে নিয়েছিল— যেখানেই যান— যা ইচ্ছে হয় করুন— তবু ঘাটে ঘাটে পৌঁছে আমার জন্যে একটা করে চিঠি লেখা চাই নিয়মিত। মনে থাকে যেন।

কবি রাণুকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি ভোলেননি। চীনের পথে ২১

~ journeybybook.com ~

মার্চ যাত্রা শুরু করেন, আর চার মাস কাটিয়ে ১৭ জুলাই কলকাতায় পৌঁছান। ২১ মার্চ থেকে ২৮ জুন— এর মধ্যে রাণুকে কবি এগারোটি চিঠি লেখেন। এতো চিঠি এই সময় কবি আর কাউকেই লেখেননি। রথীকে প্রতিমা দেবীকে নগেন্দ্রনাথ প্রমুখকে দুটি-একটি করে কাজের চিঠি লিখেছিলেন মাত্র।

কলকাতায় ফিরেই পরদিন রাণুকে লেখেন, 'তোমাকে কথা দিয়ে গিয়েছিলুম যে ঘাটে ঘাটে তোমাকে চিঠি লিখব। তাই লিখেও ছিলুম। তার পরে পিকিনে গিয়ে যখন তোমার কোনও চিঠি পেলুম না, তখন আমার আর লেখবার দায়িত্ব রইল না। এবার এতো ব্যস্ত ছিলুম যে দেশে দুই একজন ছাড়া কাউকে চিঠি লিখিইনি। কোনও মতে সময় করে তোমাকে লিখেছিলুম— এতো অজস্র চিঠি পেয়ে তোমার বোধ হয় চিঠি পাবার ক্ষিদে মরে গিয়েছিল।'

এই চিঠিরই শেষে কবি লিখছেন, 'বৌমার কাছে আশা [রাণুর দিদি] আর তোমার পাশ করার [আশা এম.এ., আর রাণু আই.এ. পাস করে প্রথম বিভাগে] খবর পেয়েছি। শুনে খুশি হলুম। আমি সেপ্টেম্বরেই আবার দূর দেশে [য়ুরোপ] যাত্রা করব— ফিরতে বোধহয় দেরি হবে। তোমাদের কলেজে এখন কোনও ছুটি আছে কি না জানিনে। যদি থাকে, আর যদি তোমরা একবার আসতে পার তাহলে খুশি হব। নইলে তোমাদের সঙ্গে আর দেখাই হবে না।'

রাণুর সঙ্গে দেখা করার ব্যাকুলতা কবির তীব্র। আগস্টে প্রায় দু' সপ্তাহের মতো কবি শান্তিনিকেতন থেকে এসে কলকাতায় কাটান। আগস্টের ২১ তারিখ নাগাদ রাণুকে কবি লেখেন, 'রাণু, ধীরেনকে [ক্ষিতিমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র] যদি পাঠাই তোমাকে আনবার জন্যে তাহলে কি আসতে পারবে? আমি বোধ হয় শীঘ্রই অর্থাৎ শনি রবিবারের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে যাব। যদি আসতে পার তাহলে সেখানেই তোমাকে নিয়ে আসবে। এবার যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হলে খুশি

~ journeybybook.com ~

হব— মোকাবিলায় সকল কথার আলোচনা হতে পারবে। আজ আর একটু পরেই এন্ড্রুজ সাহেব আসবে। যদি লোক পাঠালে তোমার আসা সম্ভব হয় তাহলে মাকে বোলো টেলিগ্রাফ করে দিতে। আজ বৃহস্পতি— কাল শুক্রবারে চিঠি পাবে।'

কবির ডাকে সাড়া দিতে রাণুর বিলম্ব হয় না। কবি রাণুকে আবার মঞ্চে নামাতে চান। বিসর্জনের পর এবার অরূপরতনে। এর আগেরবার অপর্ণা, এবার সুদর্শনা। পরবর্তী কালে রাণু তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেন, 'অরূপরতনে আমি রানীর ভূমিকায় অভিনয় করি। কিন্তু আমার ছিল মূকাভিনয়ের পার্ট। রবীন্দ্রনাথই আমাকে এই মূকাভিনয় শিখিয়েছিলেন। স্টেজের অন্তরাল থেকে গান করতেন সাহানা দেবী।'

অভিনয় হয় কলকাতার আলফ্রেড থিয়েটারে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৪-এ। মালাবার অঞ্চলের বন্যাপীড়িত জনসাধারণ ও বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে এই অভিনয়। বিসর্জনের পর রবীন্দ্রনাথ ও রাণু একসঙ্গে আবার মঞ্চে নামলেন অরূপরতনে। অভিনয় অত্যন্ত সফল হয়েছিল। খবরের কাগজ বলছে The whole show lasted for about three hours and the audience was throughout kept almost spellbound.

অভিনয়ের পরের দিন রাণুর বাবা ফণিভূষণকে কবি লিখলেন, 'কাল অরূপরতন অভিনয় হয়ে গেল, রাণু তাতে সুদর্শনা সেজেছিল। সবাই তার নৈপুণ্যে ও সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়েছে।'

দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার উদ্দেশ্যে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ কবি সদলবলে হাওড়া থেকে মাদ্রাজ মেল ধরে ২১ সেপ্টেম্বর সকালে মাদ্রাজে পৌঁছান। রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনীরা এবার কবির সঙ্গী। ২১শে সন্ধ্যায় জাহাজে উঠে ২৩শে সিংহলে এসে পৌঁছান। ২৪শে নতুন জাহাজে করে য়ুরোপ যাত্রা।

১৯১৭ থেকে এখন ক্যালেন্ডার ১৯২৪ এসে পৌঁচেছে। এই দীর্ঘ

~ journeybybook.com ~

সময় পর্বে কবি কলকাতা শান্তিনিকেতনের বাইরে দূরে যেখানেই গেছেন সেখান থেকেই কবি প্রথম পৌঁছ-সংবাদটি রাণুকেই দিয়েছেন। কোথাও পৌঁছেই ক্লান্ত শরীরে কেউ যে এতো দীর্ঘ-দীর্ঘ চিঠি লিখতে পারেন— তা বুঝি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। আর দুর্লভ সৌভাগ্য তার, যে-মেয়েটি তার আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বছরের পর বছর এমন চিঠি দূর প্রান্ত থেকে বরাবর পেয়ে এসেছে।

২১ সকালে মাদ্রাজে পৌঁছেই রাণুকে কবি লিখলেন, 'এই মাত্র মাদ্রাজে এসে পৌঁচেছি।'

২৩শে কলম্বো থেকে লিখলেন, 'ভারতবর্ষ ছেড়ে এই খানিকক্ষণ হল সিংহলে এসেছি।'

কবি কোন্ বিদেশ বিভূঁইয়ের পথে পাড়ি দিয়েছেন, কিন্তু বিষণ্ণ মনটা পড়ে রয়েছে রাণুকে ঘিরে রাণুর ভাবনায়।

মাদ্রাজে নেমে দীর্ঘ পৌঁছ-সংবাদ পত্রে কবি রাণুকে লিখলেন, 'একদিন আমার বয়স অল্প ছিল— আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে— নীল আকাশ আর শ্যামল পৃথিবী আমার জীবনপাত্রে প্রতিদিন নানারঙের অমৃতরস ঢেলে দিত— কল্পলোকের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতোই আমার বাঁশি হাতে বিহার করতুম। সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হয়েছে। লোকালয়ের কোলাহলে তার মন উদ্‌ভ্রান্ত, তারই পথের ধূলায় তার চিত্ত ম্লান,— সে আপন ক্লান্ত বিক্ষত চরণ নিয়ে তার সেই সৌন্দর্যের স্বপ্নরাজ্যে ফিরে যেতে চাচ্ছে। তার জীবনের মধ্যাহ্নে সে কাজও অনেক করেছে ভুলও কম করেনি— আজ তার কাজ করবার শক্তি নেই, ভুল করবার সাহস নেই,— আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর একবার বিশ্বপ্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষ বাঁশি বাজিয়ে যেতে চায়।...সংসারের জটিলতায় ঘিরে ঘিরে আমাদের চিত্তের উপর যে জীর্ণতার আবরণ সৃষ্টি

~ journeybybook.com ~

করে— সেটা তো ধ্রুব সত্য নয়, সেটা মায়া, সেটা যে মুহূর্তে কুহেলিকার মতো মিলিয়ে যায় অমনি নবীন নির্মল প্রাণ আপনাকে ফিরে পায়। এমনি করে বারে বারে আমরা নূতন জীবনে নূতন শিশুর রূপ ধরি। সেই নূতন জীবনের সরল বাল্যমাধুর্যের জন্যে আমার সমস্ত মন আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে।'

কবির মন যে এই মুহূর্তে কোনও জটিল ক্লিন্নতায় জর্জরিত তা রাণুকে লেখা চিঠি থেকে বেশ অনুধাবন করা যায়।

কলম্বোতে পৌঁছেও মনটা সবটুকু রাণুর জন্যে পড়ে রয়েছে। একদিকে বহির্জগতে বিশ্বের আহ্বান আর একদিকে অন্তর্জগতে মন শুধু বলছে রাণু রাণু রাণু।

'কলম্বোতে যে বাড়িতে এসে আছি, এ একজন লক্ষপতির বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রাসাদ।...এই ধনীঘরের অতি পারিপাট্য, এও যেন একটা আবরণের মতো। আমার সেই তেতলা ঘরের চেহারা মনে পড়ে তো? সমস্ত এলোমেলো। সেখানে শোবার বসবার জন্যে একটুও সাবধান হবার দরকার হয় না— তার অপরিচ্ছন্নতাই যেন তার প্রসারিত বাহু, তার অভ্যর্থনা। সে ঘর ছোটো, কিন্তু সেখানে সবাইকে ধরে। ভানুদাদার মতো এতোবড় মানুষটাকে ধরে, আর রাণুর মতো অতটুকু মেয়েকেও ধরেছিল। মানুষকে ঠিক মতো ধরবার পক্ষে হয় ছোট্ট একটি কোণ, নয় অসীম বিস্তৃত আকাশ। ছেলেবেলায় যখন আমি পদ্মার কোলে বাস করতুম তখন পাশাপাশি আমার দুই রকম বাসাই ছিল। একদিকে ছিল আমার নৌকার ছোটো ঘরটি, আর একদিকে ছিল দিগন্ত প্রসারিত বালুর চর। ঘরের মধ্যে আমার অন্তরাত্মার নিঃশ্বাস, আর চরের মধ্যে তার প্রশ্বাস। একদিকে তার অন্দরের দরজা, আর একদিকে তার সদরের দরজা। তোমার জীবনে রাণু, যদি আমার মধ্যে সেই সদর দরজাটা খুঁজে পেতে, তাহলে খোলা আকাশের স্বাদ পেয়ে হয়ত খুশি হতে। তোমার

~ journeybybook.com ~

অন্দরের দরজার অধিকার দাবি আমার তো চলবে না— এমনকী, সেখানকার চাবিটা তোমার হাতেও নেই, যার হাতে আছে সে আপনি এসে প্রবেশ করবে কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি যা দিতে পারি তুমি যদি তা চাইতে পারতে তাহলে বড় দরজাটা খোলা ছিল। কোনও মেয়েই আজ পর্যন্ত সেই সত্যকার আমাকে সত্য করে চায়নি— যদি চাইত তাহলে আমি নিজে ধন্য হতুম ; কেননা মেয়েদের চাওয়া পুরুষদের পক্ষে একটা শক্তি। সেই চাওয়ার বেগেই পুরুষ নিজের গূঢ় সম্পদকে আবিষ্কার করে— আমার একটি আধুনিক কবিতায় [পূরবীর তপোভঙ্গ] আমি এই কথা বলেছি। বলেছি, শঙ্কর যখন তপস্যায় থাকেন তখন তাঁর নিজের পূর্ণতা আবৃত হয়ে থাকে। উমার প্রার্থনা তপস্যা রূপে তাঁকে আঘাত করে যখন জাগিয়ে দেয়, তখনি তিনি সুন্দর হয়ে, পূর্ণ হয়ে, চিরনবীন হয়ে বেরিয়ে আসেন। উমার এই তপস্যা নাহলে তাঁর তো প্রকাশের ক্ষমতা নেই। কতকাল থেকে উৎসুক হয়ে আমি ইচ্ছা করেছি কোনও মেয়ে আমার সম্পূর্ণ আমাকে প্রার্থনা করুক, আমার খণ্ডিত আমাকে নয়। আজো তা হল না— সেই জন্যেই আমার সম্পূর্ণ উদ্বোধন হয়নি। কী জানি আমার উমা কোন্ দেশে কোথায় আছে? হয়ত আর জন্মে সেই তপস্বিনীর দেখা পাব।'

শিলং থেকে ফেরার পর এ-পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯২৪-এর ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কবি রাণুকে মোট বিয়াল্লিশটা চিঠি লিখেছেন। এই পর্বে কবিকে লেখা রাণুর একটি চিঠিও সংরক্ষিত হয়নি। যে একমাত্র চিঠিটি সংরক্ষিত, সেটি ১৯২৪ নভেম্বরের। বস্তুতপক্ষে ১৯১৯ আগস্টের পর থেকে ১৯৩৭-এর মে— এই আঠারো বছর সময়ের মধ্যে কবিকে লেখা রাণুর চিঠির সংখ্যা (যা পাওয়া গেছে এযাবৎ) ওই একটিই— ১৯২৪-এর নভেম্বরের চিঠিটিই। এটি

~ journeybybook.com ~

রবীন্দ্রনাথ-রাণুর সম্পর্কের ইতিহাসে খুবই মূল্যবান একটি দলিল। চিঠিটি ডার্টিংটনের এলমহার্স্ট সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। অথচ ১৯১৯ আগস্ট থেকে ১৯৩৭ মে-র মধ্যে রাণু কি রবীন্দ্রনাথকে কম চিঠি লিখেছিলেন? কবিও যেমন রাণুকে প্রচুর চিঠি লিখেছিলেন রাণুও তেমনি কবিকে অজস্র চিঠি লিখেছিলেন। কোনও নারীর সঙ্গে এতদিন ধরে এমনতর মুহুর্মুহু পত্রবিনিময় পৃথিবীর অন্য কোনও কবির জীবনে ঘটেছে কি না জানি না।

রাণু যে অনেক চিঠি এই সময়েও লিখেছিলেন তার প্রমাণ কি?

তার প্রমাণ রাণুকে লেখা কবির চিঠি থেকেই আমরা পেয়ে যাই। সেই প্রমাণ এখানে দেওয়া গেল।

After August 1919

[৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৯] : কাল তোমাকে চিঠি লিখেছি এমন সময়ে আজ তোমার চিঠি এসে উপস্থিত।

[অক্টোবর ১৯১৯] : আজ তোমার চিঠি পেলুম।

২৩ অক্টোবর ১৯১৯ : এই চিঠি পাওয়ার পরে আপাতত এখানে [ব্রুকসাইড শিলং] আমাকে চিঠি না লিখে কলকাতার ঠিকানায় লিখো, যে পর্যন্ত না শান্তিনিকেতনে যাওয়ার খবর পাও।

১৩ জানুয়ারি ১৯২০ : তোমার চিঠি পেলুম।

[২ নভেম্বর ১৯২১] : এই মাত্র তোমার জন্মদিনের চিঠি পেলুম।

৬ জানুয়ারি ১৯২২ : আজ সকালে দেখি এখানে তোমার চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ : অনেক দিন তোমার চিঠি পাইনি—কেমন আছো একটু লিখে দিয়ো।

৪ এপ্রিল ১৯২২ : তুমি আমাকে চিঠি লিখেছ শান্তিনিকেতনে, আমি সেটা পেলুম এখানে, অর্থাৎ শিলাইদহে।

৩০ আগস্ট ১৯২২ : তোমার চিঠি এসে পৌঁছল।

~ journeybybook.com ~

৪ সেপ্টেম্বর ১৯২২ : লজিকের খাতার পাতা ছিঁড়ে আমাকে চিঠি লিখেছ।

২১ ডিসেম্বর ১৯২২ : কলকাতা থেকে ফিরে এসে দেখি তোমার চিঠি আমার ডেস্কের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

[২৫ ডিসেম্বর ১৯২২] : তোমার চিঠি পেয়েই তো আমি তখনি তার উত্তর দিয়েছিলুম, কেন তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছল না তা তো বলতে পারিনে।

১৩ জানুয়ারি ১৯২৩ : কলকাতায় তোমার চিঠি পেলুম।

[জানুয়ারি ১৯২৩] : তোমার চিঠির ভাবে বোধ হল যে আমার চিঠি পাবার আগেই তুমি আমাকে লিখেছ।

[মার্চ ১৯২৩] : তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম।

৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ : তুমি জানতে চাও আমি কোথায় বসে লিখছি।

৩০ সেপ্টেম্বর [১৯২৩] : তোমার চিঠির প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর যেন দিই এই বলে তুমি আমাকে অনুরোধ করেছ।

১০ ডিসেম্বর ১৯২৩ : তুমি লিখেছ তোমার সবকথার জবাব দিতে।

[জানুয়ারি ১৯২৪] : আজ সকালে তোমার পথের চিঠি পেয়েছিলুম, আবার আজ বিকেলেই তোমার ঘরের চিঠি পাওয়া গেল।

[১১] ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ : আজ সোমবার অপরাহ্ণে তোমার পত্র বহুতর য়ুরোপাগত পত্রের সঙ্গে পাওয়া গেল।

[২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪] : কাল শনিবারে তোমার চিঠি শান্তিনিকেতনে আমাকে খুঁজতে গিয়েছিল।

৭ মার্চ ১৯২৪ : কলকাতার ঠিকানায় লিখেছ বলে তোমার চিঠিখানি আজ এইমাত্র পেলুম।

২৮ জুন ১৯২৪ : তোমার চিঠি হয়তো এক-আধখানা সাজ্ঘাইয়ে পৌঁছিয়ে পাব।

~ journeybybook.com ~

[এপ্রিল ১৯২৫] : তোর চিঠিপত্র কিছু কিছু মারা যাচ্ছে বুঝতে পারছি।

১০ জুন ১৯২৫ : প্রশান্তর হাতে তোর একখানা চিঠি পাওয়া গেল।

১৮ জুন ১৯২৫ : এই মাত্র তোর চিঠি পেলুম।

১৬ এপ্রিল ১৯২৭ : তোর চিঠি ভারতের নানা প্রদেশ ঘুরে আজ ফিরে এল।

২০ মে ১৯২৭ : তোর চিঠি পেয়েছি।

৩১ মে ১৯২৭ : তোর এবারকার চিঠিতে একটু মাত্রও উত্তাপ না দেখে আশ্চর্য হলুম।

৫ জুন ১৯২৮ : তোর চিঠি পেয়ে খুশি হলুম।

১৭ অক্টোবর ১৯২৯ : তোর চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম।

২৮ জুন ১৯৩০ : তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ : এক বছর হয়ে গেল— আজ তোর চিঠি পেলুম।

২৮ এপ্রিল ১৯৩১ : তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুশি হলুম।

১১ মার্চ ১৯৩২ : তোর চিঠিখানি কলকাতা ঘুরে শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছল।

১৩ অক্টোবর ১৯৩২ : তোর চিঠিখানি পেয়ে খুশি হয়েছি।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ : অনেক দিন পরে তোর চিঠিখানি পেয়ে ভালো লাগল।

১৭ এপ্রিল ১৯৩৬ : তোর চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম।

১২ জুন ১৯৩৬ : তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুশি হলুম।

দেখা যাচ্ছে ১৯১৯ থেকে ১৯৩৭— আঠারো বছরে রবীন্দ্রনাথকে রাণু কম করেও আটচল্লিশটি চিঠি লিখেছিলেন। অথচ এই সময়পর্বে কবিকে লেখা রাণুর মাত্র একখানি চিঠি আমরা পেয়েছি। বাকি

~ journeybybook.com ~

সাতচল্লিশটি চিঠির কোনও সন্ধান নেই। হারিয়ে গেল? কে হারাল, কেমনভাবে হারাল, নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করে ফেলা হল? কবিকে লেখা রাণুর মোট আটষট্টিটি চিঠি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ১৯১৭ জুলাই থেকে ১৯১৯ জুলাই—এই দু'বছরে রাণুর লেখা চিঠির সংখ্যা চৌষট্টি। প্রথম দিকের চিঠিগুলি রইল, আর পরিচয়ের পরিণত পর্যায়ের চিঠিগুলোই হারিয়ে গেল! কবিকে লেখা মৃণালিনীর একখানি চিঠিও পাওয়া যায়নি ; রাণুরও অর্ধশত পত্র পাওয়া গেল না। অথচ তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রায় সব নথি সব চিঠিই সযত্নে সংরক্ষিত।

১৯২০ থেকে ১৯৩৬ এই দীর্ঘ সময়ে রাণু কবিকে অজস্র চিঠি লিখলেও আমাদের হাতে কিন্তু মাত্র একখানি চিঠিই এসেছে। সেটি কবিকে লেখা রাণুর দীর্ঘতম চিঠি। রাণু-রবির সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই গুরত্বপূর্ণ চিঠি। এই চিঠির ছত্রে-ছত্রে বর্ণে-বর্ণে উভয়ের সম্পর্কের অনেক ইতিহাস কথিত, হয়ত কিছু বা অকথিত। আমরা যে-রবীন্দ্রনাথকে এবং যে-রাণুকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তাঁদের সম্পর্কের সূত্রে, তাতে রাণুর এই চিঠি আমাদের কোনও নিশানায় পৌঁছতে সহায়ক হতে পারে।

রাণুর বিবাহপূর্ববর্তী এটিই কবিকে লেখা প্রাপ্ত শেষ চিঠি। নভেম্বর ১৯২৪-এ লেখা এই চিঠির পরেও বিবাহের পূর্বে রাণু কবিকে আরও বেশ কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু সেই সময়েই সেই সব 'চিঠিপত্র কিছু কিছু মারা' যাচ্ছিল ; অর্থাৎ কবির হস্তগত হচ্ছিল না, এবং আর যে কয়টি চিঠি কবি পান সেগুলি কিন্তু আমরা আর পাইনি।

কাশী থেকে ভানুদাদাকে রাণু লিখলেন, 'অনেক দিন আপনার কোনও চিঠি পাইনি— একমাসের উপর হল। আপনি সিলোন থেকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন, মনে আছে কি ভানুদাদা? তাতে লিখেছিলেন যে আমাকে চিঠি লেখা বোধহয় আপনার পক্ষে আর সম্ভবপর হবে না। সেইজন্যেই বোধহয় চিঠি পাইনি।...

~ journeybybook.com ~

আপনার একটুখানি হাতের লেখা দেখতে আমার ভারী ইচ্ছে করে। আপনি যখন আমার চিঠি পাবেন তখন কত শত শত লোকের মাঝখানে আপনি। আমি আপনার কে ভানুদাদা যে আপনি তখন আমাকে মনে করবেন? আমি সে আশাও করি না। কিন্তু যদি কোনও দিন রাত্তিরবেলা অন্ধকারে শুতে গিয়ে আমাকে একটিবারও মনে পড়ে ভানুদাদা তাহলে

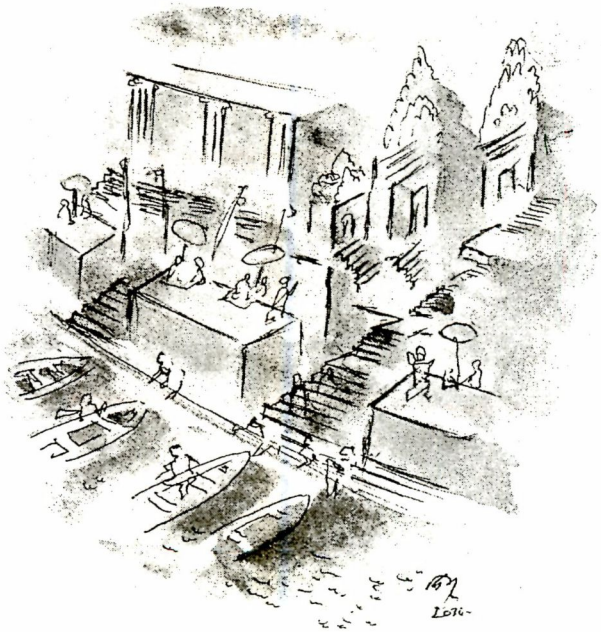

এক লাইনের একটা ছোট্ট চিঠি দেবেন ভানুদাদা যে সেদিন আমাকে মনে হয়েছে আপনার। আমি আপনার কে ভানুদাদা? আমি আপনার বন্ধুও নই, আর কেউ জানবেও না, ভানুদাদা। আমাকে পথের মাঝখান থেকে আপনি একদিন কুড়িয়ে নিয়েছিলেন, তারপর যেই আপনার

~ journeybybook.com ~

একটু খারাপ লাগল পথেই ফেলে দিয়ে গেলেন। ভানুদাদা— আমি কী বলব? ভালোবাসার কি একটা দাবি নেই? ভানুদাদা, আপনি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন না? আমার যে ভারী কান্না পায় ভানুদাদা। ভানুদাদা, আমি তো বেশি কিছু অন্যায় করিনি। আমি Paris-এ কীরকম কষ্ট পেয়ে আপনাকে চার পাঁচখানা চিঠি লিখেছি। ভানুদাদা— একটুও কি আপনাকে move করল না? ভানুদাদা, আমি কত সময় ভাবি যে অভিমান করে আপনাকে চিঠি লিখব না, কিন্তু কীরকম একলা, কীরকম বুকে কষ্ট হয় তাই আজ আবার লিখছি। ভানুদাদা, দয়া করেও কি এক লাইন লেখা যায় না? ভানুদাদা, কোলকাতা থেকে ফিরে এসেই আমার জ্বর হয়েছিল। আপনার চিঠি কখানা সেই সময়ই পাই। ভানুদাদা, আমি এতো দোষ করেছি যে আপনাকে আমি আর ভালোবাসতে পাব না? ভানুদাদা, আপনিই তো কতবার বলেছেন যে আমাদের সত্যিকারের বিয়ে হয়ে গেছে। তবে আপনি কী বলে আমাকে এমনভাবে অপমান করেছেন? আমাকে চিঠিতে আপনি যত খুশি বকুন না কিন্তু মাকে কেন লিখলেন? ভানুদাদা, আমি আপনাকে কী বলব, আমি সেই সময়গুলো সেই দুপুরবেলা সেই সন্ধ্যে, সকাল, রাত্রি, সেই আপনার একেবারে কাছে বসে যখন গল্প করতুম, সেই সময়গুলো ভাবতে পারি না। বুক টন্‌টন্‌ করতে থাকে— এতো কষ্ট হয় কিন্তু তবু বারবার ভাবতে ইচ্ছে করে। ভানুদাদা, সে সব হয়ত আপনার জীবনের একটি খেলার পালা কিন্তু আমার তা নয়। নয়, একেবারে নয়। এ যদি আমার জীবনে মিথ্যে হয় ভানুদাদা তাহলে পৃথিবীতে সত্য কাকে বলব?...ভানুদাদা, আমাকে আর ভালোবাসবেন না? ভানুদাদা, আপনি যাই বলুন আমি কাউকে কিছুতেই ভালোবাসতে পারব না। আমি বুড়োদের [পূর্ণেন্দ্রনাথ] কোনও খবর জানি না। জানতে চাইও না। সেই আমাকে তার জন্যেই তো আবার আপনি অবধি আমাকে ভালোবাসেন না। আমি তো আপনার পায়ে ছুঁয়ে বলেছি যে তাদের কোনও খবর নেব না। আমি বিয়ে করব না। কখনই,

~ journeybybook.com ~

কখনই না তাকে সে আমার পায়ে ধরে সাধলেও না। ভানুদাদা, আমি যত ভেবে দেখি, দেখি যে সে কাপুরুষ— আমি তার সঙ্গে আর কোনও রকম কিছু সম্বন্ধ রাখতে চাই না। ভানুদাদা, আগে আমার বুড়োর উপর একটুও রাগ হত না কিন্তু এখন মনে হলে ঘৃণা হয়। আমি কাউকেই বিয়ে করব না— আপনার সঙ্গে তো বিয়ে হয়ে গেছে। ভানুদাদা, আপনি হয়ত মানবেন না কিন্তু আমি মানি। আপনি আমাকে নাই ভালোবাসলেন। আপনি আমাকে নাই চিঠি দিলেন কিন্তু আমি তো মনে মনে জানব যে একদিন আমি ভানুদাদার সমস্ত আদর পেয়েছি। আমার সমস্ত শরীর ছেয়ে সে আদর আমার মনকে ভরে দিয়েছিল সে ভাবনাটুকু কেড়ে নেবার সাধ্য এ পৃথিবীতে কারুর নেই ভানুদাদা আপনারও না। নাই বা আপনি চিঠি দিলেন, আমি তো জানব মনে মনে যে একটা secret আছে যা আমি আর ভানুদাদা ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। সেই secret টুকুতে তো কারুর অধিকার নেই। ভানুদাদা, আপনাকে কত লোক ভালোবাসে, কত লোক আপনাকে চায়, কত শত শত লোক একটিবার আপনাকে চোখের দেখা দেখবার জন্যে দূর দূর দেশ থেকে আসে— আমি তাদের মাঝখানে কে ভানুদাদা? আমার এমন কোনও গুণ নেই যার জন্যে আপনার ভালোবাসার যোগ্য হতে পারি। এমন রূপও নেই ভানুদাদা যে আপনাকে মুগ্ধ করতে পারি।...আমার রূপ নেই গুণ নেই কিন্তু আমার মতন কেউ কখনও আপনাকে ভালোবাসতে পারবে না। চাই না চাই না আমি প্রতিদান। একদিন তো পেয়েছিলুম, ভানুদাদা, সে কথা ভাবতেই আমার এমন বুকে কষ্ট হয় কিন্তু তবু কেবলি বারবার ভাবতে ইচ্ছে করে।...ভানুদাদা, আমি কখনোই কাউকে বিয়ে করব না। বুড়োকে কখনোই কখনোই না। সে যদি আমার পায়ে ধরে সাধে তবুও না। সে কাপুরুষ এক sentimental লোক। আমি আর তার সঙ্গে কোনও রকম সম্বন্ধ রাখতে চাই না। তার চিঠির কথা মনে হলে আমার এমন লজ্জা করে ভানুদাদা।

~ journeybybook.com ~

সে সত্যি লোভী, true ভালোবাসা কাকে বলে ওদের সমস্ত বাড়ি একত্র করলে বোধহয় কেউ বলতে পারে না। ভানুদাদা, আপনি আমার জন্যে যা করেছেন আমাকে একসময় ভালোবাসতেন বলেই করেছেন। ভানুদাদা, বুড়ো আমার পায়ে ধরে সাধলেও আমি ওকে বিয়ে করব না। ভগবান করেন ওর সঙ্গে যেন আমার এ-জীবনে কখনও না দেখা হয়। ও শনি। আপনার আর আমার জীবনের মাঝে এসেছিল— ভগবান করেন আবার যেন যেখানে ছিল চলে যায়। ভানুদাদা, কার সাধ্য আমাকে আপনার কাছ থেকে দূরে রাখে। আমি তাকে যেসমস্ত চিঠি লিখেছিলুম, তার মধ্যে প্রায় অনেকগুলোই ও আমাকে ফিরত পাঠিয়েছিল সেগুলো পুড়িয়ে ফেলেছি। ওর সমস্ত চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছি। ওর চিহ্ন মুছে যাক, ধুয়ে যাক। ভানুদাদা, দোহাই আপনার, আমাকে কখনও বিয়ে করতে বলবেন না। আমি যেমন আছি থাকব। আপনি ছাড়া আমি কাউকে কখনও ভালোবাসতে পারব না। ভানুদাদা জানেন আমার মরতেও ইচ্ছে করে আপনার বুকের কাছে। ...ভানুদাদা— আপনি না ভালোবাসলে আমি বাঁচব কী করে? ভানুদাদা— আমি আর কখনোই কখনোই অভিনয় করব না। আমার অভিনয়ের কথা মনে হলে রাগ হয়। আমি আর কিচ্ছু চাই না কেবল আপনার ভালোবাসা।'

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা তাঁকে লেখা রাণুর 'চিঠিপত্র কিছু কিছু মারা যাচ্ছে'। কবিকে লেখা রাণুর এই চিঠি কবির হস্তগত হয়েছিল নাকি 'মারা' গিয়েছিল জোর করে বলতে পারি না। রাণুর যতগুলি চিঠি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন সেগুলির সব যে পরে রক্ষা করা হয়নি তা আমরা পূর্বেই লক্ষ করেছি। রাণুর লেখা কোনও কোনও চিঠি কবি পাননি ; আর কবির হস্তগত রাণুর বেশ কিছু চিঠি একালে আমাদের হস্তগত হয়নি। হয়ত হারিয়ে গেছে, কিংবা সেই চিঠিগুলি রক্ষা করা হয়নি। রাণুর লেখা দীর্ঘতম চিঠিটি কবি সুনিশ্চিত পেয়েছিলেন কিনা,

~ journeybybook.com ~

নাকি 'মার' গিয়েছিল, বলা যাচ্ছে না। কারণ এমনতর গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ চিঠির রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে কোনও প্রত্যুত্তর আমরা পাই না। এমনও হতে পারে এই চিঠি সেদিন কবির হস্তগত হয়নি বলেই আজ বিদেশের কোনও সংগ্রহশালায় তা সংরক্ষিত হতে পেরেছে। এবং আমরা আজ সেটি দেখতে পাচ্ছি। কবিকে লেখা রাণুর ১৯২৪ নভেম্বরের চিঠির পরে রাণুকে লেখা কবির চিঠি পাই ১৯২৫-এ ; আর্জেন্টিনা থেকে ইটালি যাবার পথে ৪ জানুয়ারি জাহাজে বসে রাণুকে কবি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে রাণুর নভেম্বরের চিঠিটির কোনও উল্লেখমাত্র নেই।

দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণান্তে ইটালি হয়ে কবি ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ বোম্বাই পৌঁছান। ইতিমধ্যে রাণুর বিবাহের প্রস্তুতি এগিয়েছে। রাণুকে নিয়ে যাঁদের আকর্ষণ এবং সেই সূত্রে টানাপোড়েন চলছিল, পাত্রনির্বাচনের ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত তাঁরা কেউই বিবেচনার অন্তর্গত হলেন না। রাণুও বিবাহ করবে না বলে সংকল্প করলেও শেষ পর্যন্ত বিবাহে রাণুরও সম্মতি মেলে। লেখিকা অনুরূপা দেবীর দৌত্যে শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণুর বিবাহের প্রস্তাব উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে পাকা হয়ে যায়। ১১ ফেব্রুয়ারি কবির কন্যা মীরা দেবী তাঁর বিদেশে অধ্যায়নরত পুত্র নীতীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'আমি কয়েকদিন আগে পাঁচ ছ দিনের জন্যে কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে তখন কাশীর রাণুরা এসেছিল। মা ও বাবা রাণুকে নিয়ে প্রশান্তদের বাড়িতে উঠেছিলেন। Sir R.N. Mukherjee-র ছেলের সঙ্গে রাণুর বিয়ের ঠিক হয়েছে, তার আশীর্বাদ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন। রাণুকে ওঁরা ২ হাজার টাকা দামের একটা হীরের নেকলেস দিয়েছেন। আষাঢ় মাসে বিয়ে হবে।...R.N. Mukherjee-দের বাড়ির মেয়েরা কাশীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন সেখানে রাণুকে দেখে ওঁদের পছন্দ হয় ও অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কথাবার্তা ঠিক হয়ে যায়।'

~ journeybybook.com ~

রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণ সাঙ্গ করে বোম্বাইয়ে পৌঁছেই রাণুর বিবাহের সংবাদ পান। কবি ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ রাণুর বাবা ফণিভূষণকে লিখলেন, 'রাণুর বিবাহের সম্বন্ধের খবর পেয়ে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হলুম। তার জন্যে আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ ছিল। নিশ্চয়ই পাত্রটি ভালোই এবং তাকে যখন রাণুর পছন্দ হয়েছে তখন কোনও কথাই নেই। যতগুলি সম্ভাবনা ঘটেছিল তার মধ্যে এইটেই যে সব চেয়ে ভালো তা নিঃসন্দেহ। ওরা দুজনে সুখী হোক এবং সর্বতোভাবে ওদের কল্যাণ হোক এই আমার কামনা।...আগামী ১৫ই এপ্রিলে ইটালি যাত্রা করব। সেখানকার সকলকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলুম— রক্ষা করতে হবে। জুন মাসে যদি রাণুর বিবাহ হয় তাহলে উপস্থিত থাকতে পারব না— কিন্তু আমার অন্তরের আশীর্বাদ তাকে বেষ্টন করে থাকবে।'

৩ মার্চ শান্তিনিকেতন থেকে কবি দুজনকে দুটি চিঠি লেখেন। একটি রাণুর মাকে, অপরটি রাণুর ভাবী শাশুড়িকে।

রাণুর মাকে লিখলেন— 'চিঠি পেয়ে বজ্রাহত হলুম। কিন্তু ভয় পেয়ো না। আমার যা সাধ্য তা করব। Lady Mukherjeeকে আজই চিঠি লিখে দিলুম। Sir Mukherjeeকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছি। খুব সম্ভব দুজনেই এখানে আসবেন। রাণুকে ব'লো বেশি উদ্বিগ্ন না হয়। সমস্তই ঠিক হয়ে যাবে।'

মুখার্জি পরিবারে রাণুর বিবাহ যাতে না হয় সেজন্য রাণুর ব্যর্থ পাণিপ্রার্থীরা অতিশয় জঘন্যভাবে তৎপর হয়ে ওঠে—যা রাণুর পরিবারের পক্ষে বিশেষ দুর্ভাবনা ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর রাণুর এই বিবাহ যাতে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় সেজন্য রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় প্রয়াস লক্ষ করবার মতো।

বীরেনের মা লেডি যাদুমতীকে কবি লিখলেন, 'কোনও এক গুপ্তনামা নিন্দুক রাণুর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া আপনাকে যে পত্র দিয়াছে রাণুর মা আজ তাহা আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

~ journeybybook.com ~

বিদেশ হইতে বোম্বাই ফিরিয়া আসিয়াই সংবাদ পাইলাম আপনাদের ঘরে রাণুর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। শুনিয়া বড় আহ্লাদে রাণুকে আশীর্বাদ করিয়া পত্র পাঠাইলাম শ্রীমান বীরেনকেও লিখিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় রাণুর মার চিঠি পাইয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি।

রাণুকে তাহার শিশুকাল হইতে জানি এবং একান্তমনে স্নেহ করি। ইহা জানি তাহার চরিত্র কলুষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার বয়সে বাঙালি ঘরের মেয়েরা যে সাধারণ অভিজ্ঞতা সহজে লাভ করে তাহার তাহা একেবারেই ছিল না। সে এমনি শিশুর মতো কাঁচা যে তাহার কথাবার্তা ও আচরণ অনেক সময় হাস্যকর হইত। এইরূপ অদ্ভুত অনভিজ্ঞতাবশত লোকব্যবহার সম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণা ছিল না। এই কারণে রাণুর বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ ছিল। আমি তাহার জন্য এমন সৎপাত্র কামনা করিতেছিলাম যে তাহার একান্ত সরলতার যথার্থ মূল্য বুঝিবে এবং লৌকিকতার ত্রুটি ক্ষমা করিবে।

এমন সময়ে প্রফুল্লনাথের [প্রফুল্লনাথ ঠাকুর] পুত্র পূর্ণেন্দু [পূর্ণেন্দ্রনাথ] আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দৈবক্রমে রাণুকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। সগোত্রে বিবাহে তাহার পিতার সম্মতি হইবে না আশঙ্কা করিয়া প্রথমে বাধা দিই। তখন প্রফুল্লনাথ কলিকাতায় ছিলেন না। পূর্ণেন্দু ও তাহার একজন গুরুস্থানীয় আত্মীয় আমাকে বারবার আশ্বাস দিলেন সে আপত্তি গুরুতর হইবে না এবং বিবাহ নিশ্চয়ই ঘটিবে।

পূর্ণেন্দু ছেলেটি ভালো, তাহার হাতে রাণু কষ্ট পাইবে না নিশ্চয় ভাবিয়া তাহাদের পরিচয়ে বাধা দিই নাই। কিন্তু পরিচয় বলিতে একবার মাত্র শান্তিনিকেতনে দেখা হইয়াছিল। রাণু তখন আমার কন্যা মীরা ও বৌমার কাছে ছিল। পূর্ণেন্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা হওয়া তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আপনি আমার কন্যা বেলাকে জানিতেন। তাহার ছোটোভাই শমী

~ journeybybook.com ~

বাঁচিয়া নাই। আমি অনেকবার ভাবিয়াছি যে, সে যদি বাঁচিয়া থাকিত তবে রাণুর সঙ্গে নিশ্চয় তাহার বিবাহ দিতাম। তাহার কারণ রাণুর মধ্যে অসামান্যতা আছে। বুদ্ধিতে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা— কিন্তু তাহার চেয়ে বড় কথা তাহার মনের নিষ্কলুষ সরলতা। ঠিক এমনটি আমি আর কোথাও দেখি নাই। এ কথা আমি আপনাকে জোর করিয়া বলিতে পারি রাণুর চরিত্রে কলঙ্কের রেখামাত্র পড়ে নাই— যদি তাহার কোনও দোষ থাকে তো সে কেবল সমাজ ব্যবহারের— তাহা পাপ নহে তাহা অজ্ঞতা। এমন পাত্রী সহজে পাওয়া যাইবে না ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

আমাদের দেশে বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারীদের বিবাহকালে গুপ্ত নিন্দাপ্রচার ইহার পূর্বে অনেকবার দেখিয়াছি, সুতরাং এই ঘটনায় বিস্মিত হই নাই। কিন্তু এমনতর মর্মান্তিক অন্যায় নিষ্ঠুরতায় যাহাদের প্রবৃত্তি হইতে পারে তাহাদের মনের কুটিল গতি আজও বুঝিতে পারি না। যদি রাণুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত আপনারা গ্রহণ করিতে না পারেন তবে তাহার ও তাহার পরিবারদের কী অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে।'

যে বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী রাণু কয়েক মাস আগেই সিদ্ধান্ত করেছিল সে আর কাউকেই বিবাহ করবে না যেহেতু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার তো বিয়ে হয়েই গেছে ('আমি কাউকেই বিয়ে করব না— আপনার সঙ্গে তো বিয়ে হয়ে গেছে'), সেই রাণুরই শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়েছে ১৯২৫-এর ২৮ জুন তারিখে।

কে বুড়ো কে গবাদা কে পূর্ণেন্দু কে সমরেন্দ্র— রাণুর মন প্রাণ হৃদয় জুড়ে সর্বাঙ্গ জুড়ে যিনি দিবানিশি অনুক্ষণ বিরাজ করেছেন তিনি তো ওই মহামানব রবীন্দ্রনাথ! বুড়ো— পূর্ণেন্দুরা সুন্দরী রাণুর অতি ক্ষণিকের খেলার সাথী মাত্র ; রাণুর মনের মধ্যে তাদের কখনওই কোনও স্থান ছিল না। কিন্তু ওই বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারীর মনের মন্দির থেকে

~ journeybybook.com ~

ওই মহামানব রবীন্দ্রনাথকে তার চিরদিনের 'সাতাশ' বছরের অনিন্দ্যসুন্দর যুবাপুরুষটিকে তার ভানুদাদাকে কে সরিয়ে নেবে? যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মনে মনে বিবাহ হয়েই গেছে তখন রাণু আর ভবিষ্যতে কাউকেই বিবাহ করতে পারে না এবং চায় না। তার সর্বাঙ্গ জুড়ে যে আদরের স্মৃতি সে বহন করে চলেছে ('একদিন আমি ভানুদাদার সমস্ত আদর পেয়েছি। আমার সমস্ত শরীর ছেয়ে যে আদর আমার মনকে ভরে দিয়েছিল সে ভাবনাটুকু কেড়ে নেবার সাধ্য এ পৃথিবীতে কারুর নেই ভানুদাদা আপনারও না')— পরে কাউকে সে বিয়ে করুক বা না করুক তার স্মৃতির পট থেকে সে-ছবি মুছে দেবে কে? রবীন্দ্রনাথ পুরুষ ; একদিন তিনিও তাঁর শৈশব থেকে যৌবনে এক নারীর স্নেহ-ভালোবাসা-আদরে অভিভূত হয়েছিলেন। পরে কবি বিবাহ করলেও সেই স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা কবি তো কখনও বিস্মৃত হতে পারেননি। রাণুও তার শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত যে-পুরুষের প্রীতি ভালোবাসা স্নেহ আদর পেয়েছে সে-স্মৃতি সে ভুলবে কেমন করে? কবি ও কাদম্বরীর মধ্যে দেবর-বউঠানের সম্পর্ক ছিল ; কিন্তু বিপত্নীক রবি ও কুমারী রাণুর প্রীতি সম্পর্কে কোনও সামাজিক বাধা ছিল না। বয়সের ব্যবধানটা ছিল বিস্তর ; তবে সেটা অন্যদের চোখে— রাণুর চোখে একেবারেই নয়, এমনকী রবীন্দ্রনাথের চোখেও নয়। রাণুর চোখে রবীন্দ্রনাথ 'সাতাশ', আর রবীন্দ্রনাথ মনে করেন তাঁর বয়স আরও কম— 'ছাব্বিশ'। সুতরাং এক বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারীর সঙ্গে এক 'ছাব্বিশ' বছরের তরুণের এই যে ধীরে ধীরে একটু একটু করে গড়ে ওঠা অন্তরঙ্গ প্রীতিসম্পর্ক— সে-সম্পর্কে বাধাটা কোথায়— যদি বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে বয়সের ব্যবধান উভয়ের কাছে তুচ্ছ মনে হয়! তাই এই বন্ধুত্বে রাণুর ছিল তীব্র আগ্রহ আর আবেগ, আর রবীন্দ্রনাথের ছিল সানন্দ সম্মতি ও প্রসন্ন প্রশ্রয়।

রাণু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। রাণুর বয়স এখন উনিশ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার যে হৃদয়ের সম্পর্ক তাকে চিরকালের জন্যে রক্ষা করতে গেলে

~ journeybybook.com ~

তাকে অন্তরের অন্তঃপুরেই স্থান দিতে হবে— তাকে নিভৃতে গোপনে সকলের অলক্ষে আশ্রয় দিতে হবে ; তা বাইরে স্থূল প্রকাশের বস্তু নয়। রাণু তাই তার ভাবনা দিয়ে বুদ্ধি দিয়েই নতুন বিবাহিতজীবনে প্রবেশে সম্মত হয়ে যায়। সংসারজীবনে সে বরণ করে নিতে সম্মত হল বীরেন্দ্রনাথকে, আর প্রেমের ক্ষেত্রে নীরবে নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেলেন রাণুর বাল্য কৈশোর যৌবনের প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রের মাকে রাণু ও পূর্ণেন্দুর সম্পর্ক বিষয়ে যে-চিঠি লিখেছিলেন, রাণু নিশ্চয় সে-চিঠি তাঁর বিবাহের পরে কোনও সময়ে তাঁর শাশুড়ির কাছ থেকে পড়ে মনে মনে হেসেছিলেন— কোথায় দুদিনের অকিঞ্চিৎকর সামান্য 'বুড়ো'—'কাপুরুষ' 'sentimental' 'লোভী' ; আর কোথায় চিরদিনের চিরকালের চিরযুবা চিরজীবী চিরসখা রবীন্দ্রনাথ। পূর্ণেন্দুর বিষয়ে রাণু যে নিষ্পাপ তাতে রাণুরও কোনও সন্দেহ নেই ; কিন্তু বিবাহপূর্ববর্তী সাত-আট বছর জুড়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে সম্পর্কের বন্ধনে রাণু জড়িয়ে ছিলেন তাকে তিনি কোনও দিন অন্তরে অস্বীকার করতে রাজি নন। রবীন্দ্রনাথ ও রাণু— উভয়ের প্রতি উভয়ের এই যে গভীর আকর্ষণ— তাতে তথাকথিত 'পাপ' থাক আর নাই থাক, তবু সেটা একটা সম্পর্কই। এই সম্পর্কের মধ্যে 'যে একটা secret আছে'— রাণুর ভাষায় 'যা আমি আর ভানুদাদা ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ জানে না' ; সেই সম্পর্কের অদৃশ্য ইতিহাস অন্যের অজানা, সুতরাং সেই সম্পর্কে সামাজিক জীবনে কোনও সমস্যা নেই, আর তাই সে-নিয়ে কোনও ব্যাখ্যা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। পূর্ণেন্দুর সঙ্গে ক্ষণিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাণু যে 'পাপ'শূন্য তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই ; কিন্তু কোনও সত্যকে গোপনতার আড়ালে রক্ষা করার প্রয়াসকে যদি পাপ বলা যায় তো তা থেকে রাণুকেও মুক্ত বলা যায় না ; এবং তা থেকে বোধকরি রাণু নিজেও মুক্ত হতে চান না।

~ journeybybook.com ~

বিবাহের পূর্বে রাণুর মনের গভীরে রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু বাইরে তার হতাশ প্রণয়প্রার্থীদের জঘন্য বর্বরতা। তারা রাণুর নামে নানা অপবাদ দিয়ে বেনামী চিঠি পাঠাচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে, রাণুর বাবা-মাকে এবং রাণুর ভাবী শ্বশুরবাড়িতে। বিবাহের প্রস্তুতিলগ্নে এইসব ঘটনা স্বভাবতই রাণুকে ব্যথিত এবং আহত করেছে। আর এই অপকর্মের আসল চক্রী ওই 'বুড়ো'— পূর্ণেন্দ্রনাথ, কবি যাকে পূর্ণেন্দু বলেন।

রবীন্দ্রনাথকে বুড়ো এই সময় কয়েকটি চিঠি লিখে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় কবিকে আঘাত করে। সেসব চিঠি রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার হাতে না দিয়ে পত্রপ্রেরকের পিতার কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রফুল্লনাথ ঠাকুর কবিকে লেখা পুত্রের তিনখানি চিঠি পড়েই রথীকে লেখেন, 'তোমার পত্র ও তৎসহ প্রেরিত বুড়োর তিনখানি পত্র পাইয়াছি। বুড়োর পত্র কয়খানি পড়িয়া আমি বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছি এবং বুড়োকে বিশেষ ভর্ৎসনা করিয়াছি।'

এদিকে রবীন্দ্রনাথের কেয়ারে খামে রাণুর নামে একটি চিঠি এলে কবি সেটি কাশীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। খামের সেই চিঠিটি পড়ে রাণুর মা রথীন্দ্রকে লেখেন, 'গুরুদেব রাণুর নামে যে চিঠিখানা তাঁর কেয়ারে এসেছিল আমায় পাঠিয়েছেন, সেটা পড়ে কয়েকটা কথা আপনাকে জানানো আবশ্যক বলে মনে করলুম। তারা [বুড়োরা] রাণুকে অনেক রকম ভয় দেখিয়ে শেষে লিখেছে বীরেনের সঙ্গে যাতে তার বিবাহ না হয় সে জন্য তারা এমন অনেক ভীষণ ভীষণ চিঠি আবার লিখছে বীরেন ও রাজেন্দ্রবাবুকেও যা থেকে তার ভানুদাদা তাকে কিছুতে বাঁচাতে পারবেন না।...গুরুদেব এই অসুস্থ শরীরে আমাদের জন্য এত কষ্ট পাচ্ছেন এই দুঃখই আমাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য যদি শীঘ্র য়ুরোপ যাওয়া আপনি উচিত জ্ঞান করেন তো সেই ব্যবস্থাই করবেন। আমাদের জন্য ভাববেন না, তাঁর মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল। তাঁর জীবনের চেয়ে আমাদের কাছে আর কিছু বেশি নয়।'

~ journeybybook.com ~

একে তো রাণু নিজের মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে শেষপর্যন্ত বিবাহে সম্মত হয়েছে ; তার উপরে বিবাহের পূর্বে বাইরের এই অভিঘাত তাকে খুবই পীড়িত ও বিচলিত করে। কলকাতা থেকে ৪ এপ্রিল ১৯২৫ রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখলেন, 'রাণু, তুমি যে দুঃখ পেয়েছ তাতে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না— ভালোই হবে, এর আঘাত একদিন কাটিয়ে উঠে সুস্থ হয়ে সুন্দর হয়ে তোমার সংসারের মধ্যে ঠিক আসনটি পেতে পারবে। তোমার নূতন জীবনের জন্যে তোমার বিধাতা কঠিন দুঃখের দাবি করেছেন। সেই মূল্য চুকিয়ে দিয়ে যা লাভ করবে তাই তোমার পক্ষে খুব বড় জিনিস হবে। তোমার মস্ত সৌভাগ্য এই যে, তোমাকে তিনি যা দিচ্ছেন তা সস্তায় দিচ্ছেন না। মূল্যবান জিনিস সস্তায় পেলে তার ঋণ থেকেই যায়। তাতে ঠিক পাওয়া হয় না। তোমার মধ্যে যা অসত্য ছিল তাই আজ এমন করে অপমানিত হল— এই তো ভালো হল। আজ অগ্নিস্নানে পবিত্র হয়ে তুমি বিশুদ্ধ নির্মলস্বরূপে তোমার সংসারে আত্মোৎসর্গের বেদী রচনা করো। সংসারের সকল কাজের মধ্য দিয়ে আপনাকে তোমার ভগবানের কাছে প্রতিদিন পূজার নৈবেদ্যের মতো সমর্পণ করতে হবে— সত্য হতে না পারলে সে নৈবেদ্য তো দেবতা গ্রহণ করতে পারবেন না। তাই তিনি নিজের জিনিসকে নিজের হাতে শোধন করে নিচ্ছেন— তাঁর হাতে দুঃখের এই অভিষেক তুমি মাথা পেতে স্বীকার করে নাও, তাতে তোমার মঙ্গল হবে।

ইতিমধ্যে বীরেন এসেছিল। যতবার তার সঙ্গে আমার আলাপ হচ্ছে ততবারই আমি খুশি হচ্ছি। তার ক্ষমা তার প্রেম তোমার পক্ষে অমূল্য সম্পদ। নিজের মধ্যে একদিকে যেমন তুমি দৈন্যের গ্লানি ভোগ করেছ বাইরে থেকে আর একদিকে তেমনি দুর্লভ ঐশ্বর্য লাভ করতে পেরেছ— এমন সার্থকতা তো সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেবল দুঃখই তো পেতে পারতে, কিন্তু তার চেয়ে আরও আক্ষেপের বিষয় হত, যদি

~ journeybybook.com ~

যা পাচ্ছ তার মূল্য বোঝবার সুযোগ না পেতে। যদি আত্মাভিমান নিয়ে বিধাতার দানকে খর্ব করতে।

বীরেনরা আরও দুটো চিঠি পেয়েছে। তাতে অপরপক্ষ ওদের অনেক শাসিয়ে লিখেছে। কিন্তু তাতে কেবল তারা নিজেদেরই উত্তরোত্তর বেশি করে ঘৃণ্য করে তুলছে। তোমার উপরে ওদের করুণা এবং স্নেহ আরও বেড়েই চলেছে। এই কথা মনে রেখে তুমি মনে সান্ত্বনা পেতে পারবে।

আমি আগামী বুধবারে শান্তিনিকেতনে যাব। সেখানে নববর্ষের উৎসব হবে— তার পরে ২৫শে বৈশাখে আমার জন্মোৎসব। আমার নূতন বাড়িও তৈরি শেষ হয়েছে। তোমরা যখন আসবে তখন আমার সমস্ত চিঠি সঙ্গে করে এনো। সকলের ইচ্ছা সে-চিঠিগুলি রক্ষা করা হয়— এখানে যত্ন করেই রাখা হবে।'

১৯১৭ আগস্ট থেকে রবীন্দ্রনাথ ও রাণুর মধ্যে যে সম্পর্কের শুরু, বস্তুতপক্ষে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মধুর মান-অভিমান প্রীতি-ভালোবাসা স্নেহ-আদরে ভরা সম্পর্কের অবসান ঘটল রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই ৪ এপ্রিল ১৯২৫-এর চিঠির মাধ্যমে।

চিঠি হয়ত কিছু কিছু মার গেছে, তবুও এই আট বছরে, ৪ এপ্রিল পর্যন্ত রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্ত চিঠির সংখ্যা ১৫৮। আর এই সময়ের মধ্যে কবিকে লেখা রাণুর প্রাপ্ত চিঠির সংখ্যা ৬৫। পাল্লায় রবীন্দ্রনাথের চিঠির সংখ্যাই বেশি।

রাণুর ঠিক বিবাহের আগেই রবীন্দ্রনাথ বললেন— রাণুকে লেখা চিঠিগুলো ফেরৎ দিতে। সম্পর্ক যখন শেষ হয়ে যায় তখন এমনটাই ঘটে। রাণুর নতুন বিবাহিত জীবনে রবীন্দ্রনাথ কোনও স্থান জুড়ে থাকতে চান না। পুরাতন সম্পর্কের স্মৃতি থেকে বিবাহিতা রাণু যাতে দ্রুত সরে আসতে পারে কবির বুঝি সেই অভিপ্রায়। এতদিন ধরে

~ journeybybook.com ~

পত্রমিতালিতে বা নিকট-সান্নিধ্যে রাণুকে যেভাবে কবি পেয়েছিলেন আর সেভাবে যে তাকে পাওয়া যাবে না, তা তো রবীন্দ্রনাথের অজানা নয়। এই আট বছর রাণু তার রূপে গুণে বুদ্ধিতে প্রেম প্রীতি ভালোবাসায় আদরে যত্নে সেবায় কবিকে তার ভানুদাদাকে একেবারে অভিভূত করে রেখেছিল। এই আট বছরে কবি যখন যেখানেই যান না কেন রাণুর সঙ্গে কবির নিত্য সম্বন্ধ ও সংযোগ ছিল। কবি যেখানেই থাকুন, মনের মধ্যে রাণু তাঁর পাশটিতেই থাকত সবসময়। কিন্তু বিবাহিত রাণুকে কবি আর কখনোই সেভাবে তাঁর সান্নিধ্যে পেতে পারেন না। তাঁর এবং রাণুর যদি ঐকান্তিক আগ্রহও থাকে, তথাপি। রাণুর বিবাহে কবির মন যে নিদারুণ শূন্যতা বোধ করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কবির বয়স এখন চৌষট্টি— নিজেই বলেছেন তাঁর দেহেমনে যৌবনের সেই সবুজ রং একটু একটু করে যেন ফিকে হয়ে আসছে। এই বয়সে আর কি তিনি কাউকে কৌতুক করে বলতে পারবেন আমার বয়স ছাব্বিশ। আর কি এই বয়সে রাণুর মতো কোনও মিতাকে নতুন করে কাছে পাবেন? কবির জীবনে রাণুর মতো একটি মেয়েকে এমন অনাবিল অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পাওয়া— এটাও কবির প্রতি বিধাতার মস্ত অনুগ্রহ মস্ত অনুকূলতা। সেই প্রীতিমধুর সম্পর্কের অবসান ঘটছে রাণুর বিবাহকে উপলক্ষ করে।

রাণুকে লেখা সব চিঠি ফেরৎ চাইলেন কবি ৪ এপ্রিল ১৯২৫-এর চিঠিতে। আর এরপর থেকেই কবি রাণুকে যতগুলি চিঠি দেন তা এতদিনের 'তুমি' সম্বোধন পরিত্যাগ করে 'তুই' সম্বোধনে। রাণুর বিবাহের ঠিক পূর্বমুহূর্তে চিঠিতে 'তুমি'র পরিবর্তে 'তুই' সম্বোধন অতিশয় আকস্মিক। কবির এই রাতারাতি সম্বোধন পরিবর্তন খুবই বিস্ময়কর। যে এতদিন 'তুমি' ছিল তাকে হঠাৎ 'তুই' সম্বোধন করলেই এতো দীর্ঘ সময়ের এমন গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সূত্র ছেঁড়া যায়? রবীন্দ্রনাথ রাণুকে 'তুই' সম্বোধন করে তাঁদের সুদীর্ঘকালের মধুর সম্পর্কের সূত্রটি বাহ্যত ছিঁড়তে চেয়েছিলেন। গড়ে ওঠা এই সম্পর্ক যাতে রাণুর বিবাহিত জীবনে কোনও

~ journeybybook.com ~

বিঘ্ন সৃষ্টি না করে তা কবি চেয়েছিলেন। রাণুর এই মুহূর্তের সামাজিক অবস্থানের বিষয়ে কবি সচেতন।

১৯২৫-এর ৫ এপ্রিল থেকে ১৯৪০ এই সময়পর্বে 'তুই' সম্বোধনে রাণুকে লেখা কবির চিঠির সংখ্যা ৫০। এই পঞ্চাশটি চিঠিই ছোটো আয়তনের— অনেক ক্ষেত্রেই শুধু প্রয়োজনীয় কথাবার্তা। বইয়ের পাতায় শেষ পঞ্চাশটি চিঠি ছাপতে যেখানে পঞ্চাশ পাতা লাগে সেখানে কবির রাণুকে লেখা প্রথম পঞ্চাশটি চিঠি ছাপতে জায়গা লেগেছে একশো চোদ্দ পাতা। যেখানে শেষ যোলো বছরে পঞ্চাশটি চিঠি, সেখানে প্রথম আট বছরে কবির লেখা চিঠির সংখ্যা একশো আটান্ন। কবি যে চিঠির শেষে লিখেছেন— 'তোমরা যখন আসবে তখন আমার সমস্ত চিঠি সঙ্গে করে এনো'— এই একটা বাক্যই বুদ্ধিমতী রাণুকেও বুঝিয়ে দিচ্ছে ওই মহামানবের সঙ্গে সম্পর্কের এই সমাপ্তি। মহামানবও মানব বলেই সচেতনভাবেই এইখানে রাণুর সঙ্গে তাঁর এতকালের সেই গড়েওঠা বিশেষ সম্পর্কের সূত্রটি ছিন্ন করে ফেলতে চান। মনের মধ্যে রাণু যেখানে থাক, আগামী কাল থেকে রাণু কবির কাছে আর পাঁচটি সাধারণ মেয়ে থেকে আলাদা নয় এবং স্বতন্ত্র বিশেষ কেউ নয়। অধিকাংশ বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহভাজনকে কবি যেভাবে তুই সম্বোধনে ডাকেন, ৫ এপ্রিল থেকে তাঁর সেই প্রিয় শ্রীমতী রাণু সুন্দরী দেবী হঠাৎই আর-পাঁচজন মেয়ের একজন হয়ে গেলেন বাহ্যত। বুদ্ধিমতী রাণুর এই সম্বোধন পরিবর্তনের অর্থটা বুঝতে বোধ করি বিলম্ব ঘটেনি। কবিও বুঝেছিলেন রাণু নিশ্চয় বুঝবে। যেন এই ছোট্ট চিঠির শেষ দুটি ছত্রই বলে দিল— হে বন্ধু বিদায়।

১৯২৫-এর ২৮ জুন রাণুর বিবাহ হয়ে গেল বীরেন্দ্রের সঙ্গে।

২৭ জুন কলকাতা থেকে কবি রাণুকে লিখলেন, 'কল্যাণীয়াসু রাণু আশীর্বাদসহ কিছু উপহার পাঠালুম। তোর কোনও কাজে লাগবে না জানি। কিন্তু আমার যা সব-চেয়ে দেবার জিনিস তাই দিলুম। হয়ত

~ journeybybook.com ~

স্বরলিপির বইগুলো কখনও কখনও দরকার হতে পারে। এগুলো তোরা একবার দেখে তার পরে সার্ রাজেনের [রাণুর শিল্পপতি শ্বশুর] ওখানে পাঠিয়ে দিস— কারণ সেখানে ওঁর য়ুরোপীয় আমন্ত্রিতরা হয়ত এর মূল্য বুঝবে। ইতি ১৩ আষাঢ় [১৩৩২, ২৭ জুন ১৯২৫] ভানুদাদা।'

রাণুকে কবির 'যা সব-চেয়ে দেবার জিনিস' তা কী? ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন, 'রবিকা তাঁর সব গ্রন্থাবলী একই ধরণে বেশ সুন্দর বাঁধিয়ে সব বইয়ের ভিতরে স্বহস্তে আশীর্বাদ লিখে একটা কাঁচের আলমারিসহ রাণুকে উপহার দিয়েছেন।'

একজন স্রষ্টার কাছে তাঁর সৃষ্টির চেয়ে দামি আর কী থাকতে পারে? কবি তাঁর সারাজীবনের সৃষ্টি রাণুর হাতে তুলে দিলেন তার বিবাহে।

রাণুর সঙ্গে পরিচয় থেকে রাণুর বিবাহ— কবির জীবন-ইতিহাসে এ যেন একটা বিশেষ অধ্যায়। রাণু ও রবিকে ঘিরে প্রীতি-ভালোবাসার যে একটি বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা যে-কোনও কল্পিত রোমান্টিক গল্প-উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। ১৯১৭ থেকে ১৯২৫-এর ইতিহাস। রাণুর বিবাহে এই জীবন-উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। তারপর আর কোনও গল্প নেই, কাহিনি নেই। রাণুর বিবাহের পরেও বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু সেখানে কোনও গল্প ছিল না। ১৯২৫-এর ২৮ জুনের পরবর্তী রাণু-রবীন্দ্রের যে সম্পর্ক তার ইতিহাস রবীন্দ্রজীবনীকারদের তথ্যপঞ্জিরচনার কাজে লাগতে পারে, জীবন-উপন্যাস রচয়িতার কোনও কাজে লাগবে না। 'তোর সন্তান দুটিকে এবং সন্তান দুটির জননীকে দেখবার ইচ্ছে রইল।' কিংবা, 'তোর ছেলেদের জন্যে দু সের দুধ দাবি করেছিস— আমি তিন সেরের বন্দোবস্ত করব কেননা এখানে এলে তাদের ক্ষিদে বাড়বে।' এসব সংবাদে পরিবারকল্যাণ বা জনস্বাস্থ্যবিভাগের কৌতূহল থাকতে পারে, কিন্তু জীবনরসরসিকের তাতে কোনও আগ্রহ বা ঔৎসুক্য নেই।

~ journeybybook.com ~

১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস লিখলেন ; অমিত-লাবণ্যর প্রেমের কাহিনি। সে-কাহিনিও শেষ হয়েছিল লাবণ্যর সঙ্গে শোভনলালের বিবাহের সংবাদের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ও রাণুকে ঘিরে যে একটি মধুর সম্পর্কের বৃত্ত একদা গড়ে উঠেছিল তারই কি প্রতিফলন ঘটেছে শিলং পাহাড়ের পটভূমিকায় অমিত ও লাবণ্যর উপাখ্যান সৃষ্টিকর্মে? কবি যখন ১৯২৮-এর জুনে বাঙ্গালোরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বাংলোয় বসে শেষের কবিতা উপন্যাসটি লেখা শেষ করেছেন সেই সময় একদিন রাণী মহলানবিশের এক প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেছিলেন শেষের কবিতার লাবণ্য তাঁর খুব চেনা চরিত্র। কবির মুখের ভাষায়— লাবণ্যর সঙ্গে যেন আমার চেনাশোনা আছে, খুব যেন তাকে দেখেছি।

আগেই বলেছি, ১৯১৯-এ কবি প্রথম শিলং-এ গিয়েছিলেন, আর এও বলেছি ১৯২৩-এ কবির দ্বিতীয় শিলংভ্রমণপর্বে কবির সঙ্গী ছিলেন রাণু— দীর্ঘ প্রায় দেড় মাস। আমরা এও জেনেছি, রাণুর বিবাহ হয়ে গিয়েছে ১৯২৫ সালে।

এর পরের দৃশ্য নরওয়েতে। ১৯২৬ সালের আগস্ট মাস। নরওয়েতে একটি চলমান মোটরগাড়ির পিছনের আসনে উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথ, তাঁর পাশে প্রশান্তচন্দ্রের স্ত্রী রাণী মহলানবিশ। 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' বইতে রাণী লিখেছেন, 'বেড়াবার পথে যেতে যেতে কবি বললেন : একটা কথা মাঝে মাঝে ভাবি, আধুনিককালের ছেলেমেয়েরা কিন্তু রোমান্স করতেও জানে না। তাই আধুনিক সাহিত্যের আজকাল এই রকম চেহারা। সবাই যেন স্থূল। কোনও সুন্দর জিনিসই সুশ্রীভাবে ভোগ করতে জানে না। সবেতেই লোলুপতার ছাপ লেগে কুশ্রী হয়ে ওঠে। আগেকার দিনে বিবাহটাকেও লোকে রসিয়ে ভোগ করতে পারত। তাই মিলনের সমানই তাতে আনন্দ পেয়েছে বেদনার মধ্য দিয়ে। এদেশের পুরনো কালের সাহিত্যে তার পরিচয় পাই। আর আজকের দিনে যাকে সকলে আধুনিক সাহিত্য বলছে তার মধ্যে কেবলই বাস্তবের দোহাই দিয়ে সুন্দরের

~ journeybybook.com ~

অপমান। বিধাতা আমাদের কল্পনাশক্তি দিয়েছেন কেন? প্রতিদিনের জীবনযাত্রার দৈন্যের মধ্যেও নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে সৌন্দর্য রচনা করে তো সে দৈন্য খানিকটা ঘোচাতে পারি। সাহিত্য তো সেই কাজই করবে। ধরো একটি ছেলে ও মেয়ে পরস্পরকে ভালোবাসে এবং তারা পেয়েওছে পরস্পরকে। তবু তারা এমনভাবে চলতে পারে যাতে গোড়াকার রোমান্স চিরকালই বজায় রাখা যায়। যেমন, একটা মিউজিক কখনও পুরনো হয় না। ধরো, তারা নিয়ম করল প্রতিদিন দেখাশোনা হবে না। যেদিন হবে সেদিন বিশেষভাবে যত্ন নিয়ে সাজসজ্জা করবে। মেয়েটি যদি বাজাতে জানে এমন হয়, তবে তার যন্ত্রটা কাছে নিয়ে তার প্রিয়তমের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। আকাশে চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে, সমস্ত প্রকৃতি যেন আজ বিশেষভাবে প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। মেয়েটি আস্তে আস্তে তার বীণায় ঝঙ্কার দিচ্ছে আর ভাবছে, এই বুঝি এল। দুদিকে দুখানা বাড়ি মাঝখানে দীঘি দিয়ে পৃথক করা, আর তার উপরে সাঁকো। মেয়েটির কাছ থেকে অনুমতি না পেলে ছেলেটি তার কাছে আসতে পারবে না— এ নিয়ম তারা নিজেরাই করে রেখেছে।'

শেষের কবিতার সুর রবীন্দ্রনাথের মনের বীণায় বাজতে শুরু করেছে। আর তাই কি মন টানছে শিলং পাহাড়ে আর-একবার ঘুরে আসতে। হ্যাঁ, পরের বছরেই ১৯২৭-এর মে-মাসে কবি সমতল ছেড়ে উঠে এলেন স্মৃতিঘেরা সেই মেঘের আলয় শিলং পাহাড়ে। ১৯১৯-এ শিলং-এ পৌঁছেই রাণুকে কবি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন এই শৈলশহরে আসার যাত্রাপথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে। ১৯২৭-এ শিলং-এ পৌঁছেও কবি রাণুকে একটি চিঠি লিখলেন পৌঁছসংবাদ জানিয়ে। চিঠির তারিখ ২৭ বৈশাখ ১৩৩৪ অর্থাৎ ১০মে ১৯২৭। কল্যাণীয়াসু রাণুকে লিখলেন, 'শিলং-এ এসে পৌঁচেছি। কিন্তু এ আর এক শিলং। আগে যেখানে ছিলুম কেমন নিরিবিলি,— আসবাবপত্র ছিল না, ঘর দুয়ার অপরিপাটি কিন্তু কেমন খোলা— দু-পা বাইরে গেলেই সেই নির্জন

~ journeybybook.com ~

রাস্তা, ঘন বনের ছায়া— একটু করে লিখছি আর সেই রাস্তায় বেরিয়ে পায়চারি করে আসছি— দিনগুলোর মধ্যে কোথাও একটু ফাঁকা ছিল না। এখন যেখানে আছি, ইংরেজের বাড়ি, ফিট্‌ফাট্, কার্পেট পাতা, চারদিকে পর্দা টানা, ছিটের ঢাকা দেওয়া চৌকি, সোফা ; পালিশ করা মস্ত বড় ডিনার টেবিল ইত্যাদি ইত্যাদি— কিন্তু শিলং পাহাড় এখানে বোবা। একরকম লেবু আছে যার প্রায় সমস্তটাই খোসা, খুব মস্ত বড় কিন্তু ভিতরে শাঁস নেই বললেই হয়। এবারকার এ-শিলংটাকে সেইরকম মনে হচ্ছে।'

শিলং-এ কবি এবার লাইমোখরার ধারে আপল্যান্ডস্ বাড়িতে উঠেছেন। আমাদের মনে আছে প্রথমবারে ব্রুকসাইড-এ এবং দ্বিতীয়বারে জিৎভূমিতে। শিলং কবিকে বারবার কাছে টেনেছে ; কিন্তু এবারের শিলং-এ কবি আগেরবারের সেই প্রাণের স্পন্দন অনুভব করছেন না। এ-শিলং যেন সেই পূর্বের শিলং নয়। এ-শিলং যেন প্রাণহীন, কবির ভাষায় বোবা শিলং। ১৯২৩-এ এই শিলং-এ পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে রাণুর সঙ্গে কবি হেঁটে বেড়িয়েছেন। শিলংবাসীরা সেই দৃশ্য উপভোগ করেছেন দেখে। ১৯২৭-এ বসে ১৯২৩-এর সেই ফেলে আসা স্মৃতি নিশ্চয় কবির মনের আকাশে ছায়া ফেলে যায়। শিলংসঙ্গী সেই সপ্তদশী রাণুর কথা নিশ্চয় কবির মনে পড়ে। মনে পড়ে বলেই শিলং-এ পৌঁছেই রাণুকে পত্র লেখেন ; দুঃখ করে বলেন— এ-শিলং সে-শিলং নয়। এক মে-তে শিলং আর পরের মে-তে, ১৯২৮-এ, দক্ষিণ ভারতের কুন্নুর শহরে বসে কবি লিখতে শুরু করলেন শিলং পাহাড়ের পটভূমিতে তাঁর নবতম উপন্যাস শেষের কবিতা, প্রথমে যার নাম রেখেছিলেন 'মিতা'।

কলম্বো যাত্রার পথে কবি তখন দক্ষিণ ভারতের কুন্নুরে। কবির সঙ্গীদের মধ্যে আছেন প্রশান্তচন্দ্র ও রাণী। এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় রাণীর আবদার মেটাতে গল্প বলতে শুরু করলেন কবি। অনুরোধে উপরোধে কবি কতজনকেই না তাৎক্ষণিক বানিয়ে বানিয়ে কত গল্পই না বলেছেন। এবার রাণীর অনুরোধে শুরু হল গল্প বলা।

~ journeybybook.com ~

'টিং টিং টিং টেলিফোন বেজে উঠেছে, বাড়ির একটি মেয়ে গিয়ে ধরল টেলিফোন— ও প্রান্ত থেকে যে কথা কইছে তার গলা অচেনা, ছেলেটি কিছুতেই নাম বললে না। খানিকটা কথা হবার পর হঠাৎ টেলিফোন থেমে গেল। মেয়েটি তো অবাক। কে, কী বৃত্তান্ত, কিছুই জানে না, অথচ কথা বলার পর থেকে বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। পরদিন আবার ঘণ্টা। ক্রমে এমন হল যে মেয়েটি রোজ অপেক্ষা করে থাকে বিকেলবেলা টেলিফোন বাজবে বলে। যে-ছেলেটি কথা বলে সে কিছুতেই নাম ঠিকানা বলে না। শুধু এইটুকু বলেছে যে সেও কখনও মেয়েটিকে দেখেনি, তবু তার কথা এতো শুনেছে যে, আলাপ না করে থাকতে পারল না।'

কবি কেদারায় বসে গল্প বলে চলেছেন, বাইরে এদিকে বৃষ্টিরও বিরাম নেই।

'মেয়েটির বাড়িতে সে যে আসতে চায় না, তার কারণ, পাছে দেখা হলে তার এই ভালোলাগাটুকু চলে যায়, তাই সে দূরে দূরেই রইল। টেলিফোনের ভিতর দিয়ে এই যে পরিচয় সেইটুকুতেই সে খুশি থাকবে। মেয়েটির কথা কার কাছ থেকে শুনেছে তাও সে কিছুতেই বলতে রাজি নয়। এই রকম করে টেলিফোনের আলাপ যখন বেশ জমে উঠেছে এমন সময় হঠাৎ একদিন ছেলেটি বললে যে সে বিদেশে চলে যাচ্ছে কাজেই আর গল্প করা হবে না। কিছুদিন পরে মেয়েটি শিলং পাহাড়ে চেঞ্জে গেল। সেখানে একদিন গাড়ির আকস্মিক দুর্ঘটনা। যে ভদ্রলোক সাহায্য করলেন তাঁর গলা শুনে মেয়েটি চমকে উঠল, তিনি বুঝলেন কাকে সাহায্য করেছেন। টেলিফোনের ভিতর দিয়ে তাদের এতো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল যে পরস্পরকে চিনতে একটুও দেরি হল না।'

রাণী পরের দিন সকালেই নতুন খাতা কলম সাজিয়ে দিলেন কবির টেবিলে। লিখতেই হবে এ-গল্প আপনাকে— রাণীর জেদ কবির প্রতি। সুতরাং লেখায় হাত দিতেই হল ; এবং পরদিন সকাল থেকেই শুরু হল

~ journeybybook.com ~

নতুন বাঁধান খাতায় অমিত-লাবণ্যর অসামান্য প্রেমকাহিনি— এক আশ্চর্য রোমান্টিক উপন্যাস।

স্থূল শরীরের আকর্ষণ ছাড়াও কি নর-নারী পরস্পরে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে? আর যথার্থ প্রকৃত যে প্রেম সে কি সীমার মাঝে বদ্ধ নাকি অসীমের মধ্যে মুক্ত? বিনা সাক্ষাতে পারস্পরিক অদর্শনেও কি প্রেমের সঞ্চার হতে পারে নারী-পুরুষের মধ্যে? কবি তাঁর গল্পে দুজনের টেলিফোনের মাধ্যমে আলাপ ও পারস্পরিক আকর্ষণের কথা বলেছেন। কিন্তু এ-গল্প টেলিফোন কেন, চিঠির ক্ষেত্রেও তো একই রকম হতে পারে। দুজনের দুজনকে চিঠি লেখালেখি চলছে কিন্তু দুজনের কারওরই সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি। এই পর্যায়ে উভয়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা জন্মাতে পারে। কল্পনায় কেন, রাণু ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বেশ কয়েকটি চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয় উভয়ের দেখাসাক্ষাতের পূর্বেই। উভয়ের প্রথম সাক্ষাতের পূর্বে প্রায় এক বছর পরস্পরের পত্র-বিনিময় চলে। কবিকে রাণু এই সময়ের মধ্যে বারোটি আর রাণুকে কবি সাতটি চিঠি লেখেন। অদর্শনেও দুটি মানুষে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা জন্মাতে পারে এবং দূর থেকে এই যে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা তার তীব্রতাও কিছু কম নয় ; সেই প্রেমেরই সত্য কবি খুঁজতে চান, আবিষ্কার করতে চান। রাণুর মধ্য দিয়ে সেই প্রেমের সত্য কবির কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যে-রাণু ও যে-রবীন্দ্রনাথ একদিন পরস্পরে দূরে ছিলেন, তাঁরাই সাক্ষাতের পর উভয়েই মনের দিক থেকে উভয়ের আরও বেশি নিকটবর্তী হলেন।

রাণুর সঙ্গে কবির এই যে ব্যতিক্রমী প্রীতিসম্পর্ক, একে রবীন্দ্রনাথ জীবনের মধ্যেই একটা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করতে চাইলেন। কেমন হবে রাণুর প্রতি রবীন্দ্রের ভালোবাসা, আর কেমনই বা হওয়া উচিত রবীন্দ্রনাথের প্রতি রাণুর দুর্দমনীয় প্রেম?

~ journeybybook.com ~

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবন ও জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে প্রেমের সত্য আবিষ্কার করতে চান। রাণুর ভালোবাসা দিয়েই তার পরীক্ষা হোক কবিজীবনে।

১৩২৫-এর যে-শ্রাবণে (জুলাই ১৯১৮) রাণু পত্রযোগে কবিকে চুম্বনাদর জানাচ্ছে সেই শ্রাবণে কবি শান্তিনিকেতন থেকে রাণুকে লিখছেন, 'খুব বেদনার সময় তুমি যখন তোমার সরল এবং সরস জীবনটি নিয়ে খুব সহজে আমার কাছে এলে এবং এক মুহূর্তে আমার স্নেহ অধিকার করলে তখন আমার জীবন আপন কাজে বল পেলে— আমি প্রসন্ন চিত্তে আমার ঠাকুরের সেবায় লেগে গেলুম। কিন্তু তোমার প্রতি এই স্নেহে যদি আমাকে বল না দিয়ে দুর্বল করত, আমাকে মুক্ত না করে বদ্ধ করত তাহলে আমার প্রভুর কাছে আমি তার কী জবাব দিতুম?...তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে আমার ঠাকুর আমাকে আরও বেশি বল দিয়েছেন। তুমিও তেমনি বল পাও আমি কেবল এই কামনা করছি। তোমার ভালোবাসা তোমার চারদিকে সুন্দর হয়ে বাধামুক্ত হয়ে ছড়িয়ে যাক— তোমার মন ফুলের মতো মাধুর্যে পবিত্রতায় পূর্ণ বিকশিত হয়ে তোমার চতুর্দিকে আনন্দিত করে তুলুক।...আমি তোমাকে যখন পারব চিঠি লিখব— কিন্তু চিঠি যদি লিখতে দেরি হয়, লিখতে যদি নাও পারি তাতেই বা এমন কী দুঃখ। তোমাকে যখন স্নেহ করি তখন চিঠির চেয়েও আমার মন তোমার ঢের বেশি কাছে আছে।'

৯ এপ্রিল ১৯১৯-এ কবি লিখছেন, 'ঈশ্বর আমাকে তাঁরই বিশেষ কাজে পাঠিয়েছেন— তাঁরই হুকুমে আমার নিজের কোনও ভোগ সংসারের কোনও বন্ধন আমাকে আটক করতে পারবে না। আমি আমার সেই পথিকবন্ধুর পথের সঙ্গী। তুমি তোমার আঙিনায় খেলা করছিলে এমন সময় দৈবাৎ এই পথচলা পথিকের সঙ্গে দেখা হল, তার অন্তরের

~ journeybybook.com ~

স্নেহ-আশীর্বাদ পেলে— এই ঘটনাটুকুতে তোমার জীবনের আঙিনায় মুক্তির হাওয়া খেলুক, তুমি আপনাকে ভোল— আমারও পথের উপরে মাধুর্যের সুগন্ধ আনুক, আমিও আপনাকে ভুলি। শোক যাক, অবসাদ যাক, মোহ যাক— অন্তর বাহির সুপ্রসন্ন হোক।'

কবি রাণুকে যেভাবে পেতে চান, একটি তরুণীর মন সেভাবে হঠাৎ দীক্ষিত হবে কেমন করে? কবিকে রাণু মন-প্রাণ দিয়ে হৃদয় দিয়ে পেতে চায় ভালোবাসতে চায়। তথাপি কবির চিঠি রাণুকে প্রভাবিত করে, তার আবেগ কিঞ্চিৎ সংযত করে, পত্রে অবিরত চুম্বন প্রেরণ বন্ধ হয় ; এবং কবির প্রতি ভালোবাসা ক্রমেই গভীরতর হয়।

রাণু রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসে, এবং সেই ভালোবাসা একসময় হয়ত মোহে পরিণত হয়ে থাকতে পারে এবং সেই মোহের আবেগে সে হয়ত কবিকে একান্তভাবে তারই বলে পেতে চায় এবং হয়ত কবিকে সে তার সর্বাঙ্গ দিয়েও পেতে চায়। হয়ত কোনও মুহূর্তে কবি তাঁর দেহে রাণুর আদর গ্রহণ করেও থাকতে পারেন ; কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই জৈব বদ্ধপ্রেম থেকেই তো কবি মুক্তির পথ খুঁজতে চান। মুক্তির মধ্য দিয়েই নারীর প্রেমকে কবি সাদরে বরণ করে নিতে চান।

নিজের জীবনে রাণু, আধুনিক ছেলেমেয়েদের রোমান্স, টেলিফোনের মাধ্যমে দুটি ছেলেমেয়ের মধ্যে আলাপ এবং শিলং পাহাড়ে মোটরদুর্ঘটনায় তাদের প্রথম সাক্ষাতের গল্প— এ-সবই একে একে শেষের কবিতা উপন্যাসের অভ্যন্তরস্থিত তত্ত্বনির্মাণের পক্ষে সহায়ক হচ্ছিল। রাণুকে কবি বিভিন্ন চিঠিতে প্রেম ভালোবাসা বিবাহ দাম্পত্যসম্পর্ক বিষয়ে যেসব চিঠি লিখেছেন শেষের কবিতা উপন্যাসে অমিত-লাবণ্যর সংলাপ যেন তারই পুনঃকথন এবং পুনর্ব্যাখ্যান।

আমাদের মনে আছে রাণু তার বিয়ের মাস ছ-সাত আগে কবিকে

~ journeybybook.com ~

চিঠিতে লেখে, 'আমি কাউকেই বিয়ে করব না— আপনার সঙ্গে তো বিয়ে হয়ে গেছে। ভানুদাদা আপনি হয়ত মানবেন না কিন্তু আমি মানি।' এটা কেউ মানুক বা না-মানুক, আমাদের কাছে সেটা বড় কথা নয় ; আমরা দেখছি রবীন্দ্রনাথ শেষের কবিতা উপন্যাস লিখতে গিয়ে অমিতর চরিত্রনির্মাণে নিজের ভাবনার জগতটিকেই যেন উন্মোচিত করছেন। লাবণ্যর মুখ দিয়ে অমিত-চরিত্রের যে-ব্যাখ্যা সে তো আসলে যেন কবির কলমে কবির আত্মোৎঘাটন। লাবণ্য অমিত-চরিত্রের যে-ব্যাখ্যা করেছে, যে-কোনও নারীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথকেও তেমনভাবেই দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ রাণুকেই ১৯২৪ সেপ্টেম্বরে বিদেশ থেকে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন, 'কতকাল থেকে উৎসুক হয়ে আমি ইচ্ছা করেছি কোনও মেয়ে আমার সম্পূর্ণ আমাকে প্রার্থনা করুক, আমার খণ্ডিত আমাকে নয়। আজো তা হল না।'

বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারী রাণুর কবির প্রতি যে-প্রেম সেই প্রেমের জীবন্ত অভিজ্ঞতা শেষের কবিতা উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথের কাজে লেগেছিল। রাণুর সেই মোহমুগ্ধ পার্থিব প্রেমের বন্ধনে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেন না কিছুতেই। তাঁর প্রেমকে ভালোবাসাকে কবি কখনই কোনও ঘড়ার জলের মধ্যে বদ্ধ করে রাখতে পারেন না সমুদ্রের আহ্বানকে অস্বীকার করে। এই কবিচরিত্রেরই যেন ব্যাখ্যা পাই শিলং পাহাড়ে অমিতর সঙ্গে লাবণ্যর আলাপে।

'মিতা, তোমার রুচি তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না— না না, কিছু বোলো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়ো না।

~ journeybybook.com ~

বিয়ে করে তখন গ্রন্থি খুলতে গেলে তাতে আরও জট পড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্যন্ত চলবে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ো না।'

'বন্যা, তুমি আজকের দিনের ঔদার্যের মধ্যে কালকের দিনের কার্পণ্যের আশঙ্কা কেন তুলছ।'

'মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েছ। আজ তোমাকে যা বলছি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জান। মানতে চাও না, পাছে যে রস এখন ভোগ করছ তাতে একটুও খটকা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ফের ; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেছ। বলব ঠিক কথাটা? বিয়েটা তুমি মনে মনে জান, যাকে তুমি সর্বদাই বল ভাল্‌গার।'

মাঝে মাঝে লাবণ্যর কণ্ঠের ভাষায় রাণুর চিঠির ভাষার ছায়া দেখি।

অমিত প্রসঙ্গে যোগমায়ার সঙ্গে আলোচনাকালে লাবণ্য বলেছে, 'বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাইনে। বিয়ে সকলের জন্যে নয়।...উনি তো আমাকে চান না। যে আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করিনে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয় তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।'

লাবণ্যর এই কথাগুলি শুনতে শুনতে মনে হয় যেন মন খারাপ করে কবিকে চিঠি লিখছে রাণু।

~ journeybybook.com ~

'আমার চেয়ে কত শত শত সুন্দরী মেয়ে আপনার ভালোবাসা চায় তবু আপনি আমাকে ভালোবেসেছিলেন। এখন যদি না ভালোবাসেন তবে আমি কী বলব ভানুদাদা? আপনার জীবনে অনেক নতুনত্বের মধ্যে এ হয়ত একটা খেলা কিন্তু ভানুদাদা আমি যে আপনাকে ভারী ভালোবাসি ভানুদাদা। আমার রূপ নেই গুণ নেই কিন্তু আমার মতন কেউ কখনও আপনাকে ভালোবাসতে পারবে না। চাই না চাই না আমি প্রতিদান।'

রাণু-রবীন্দ্রের যে মধুর সম্পর্কটি আট বছর ধরে গড়ে উঠেছিল নিবিড়ভাবে, সেই সম্পর্কের বস্তুত সমাপ্তি ঘটে সম্বন্ধ করে রাণুর সঙ্গে বীরেন্দ্রের বিবাহের সূত্রে। রাণু-রবীন্দ্রের চরিতোপন্যাসের মূলত এইখানেই পরিসমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য সৃষ্টি শেষের কবিতারও শেষ অমিত-কেতকীর এবং লাবণ্য-শোভনলালের বিবাহ-সংবাদের মধ্যে দিয়ে।

শেষের কবিতার রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত প্রেসকপিতে উপন্যাসের পরিণতিতে অমিতর সঙ্গে কেটির এবং লাবণ্যর সঙ্গে শোভনলালের বিবাহের কোনও সংবাদ বা ইঙ্গিত কিছুই নেই।

পাণ্ডুলিপিতে উপন্যাসের উপান্ত পরিচ্ছেদের ('মুক্তি') শেষ দুই বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ : 'সমস্ত শিলং পাহাড়ের শ্রী আজ চলে গেছে। অমিত কোথাও আর সান্ত্বনা পেল না।' ছাপা বইতেও তাই।

অতঃপর শেষ পরিচ্ছেদ ; বইতে যার শিরোনাম 'শেষের কবিতা', পাণ্ডুলিপিতে তার শিরোনাম 'শেষ কবিতা'।

পাণ্ডুলিপিতে শেষ পরিচ্ছেদটি খুবই সংক্ষিপ্ত। প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি :

'দুটো দিন গেলে পর অমিত গেল ডাকঘরে। জিজ্ঞাসা করল, "যোগমায়া দেবী কি তাঁদের ঠিকানা দিয়ে গেছেন?"

~ journeybybook.com ~

ডাকবাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

"আমি সেই ঠিকানাটি চাই।"

"কাউকে জানাতে বারণ।"

একটুখানি চুপ করে অমিত দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলে, বারণটা বিশেষ করে তারই সম্বন্ধে।

পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করে ডাকবাবুকে দিয়ে বললে, "এর উপরে লাবণ্য দেবীর ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দেবে।"

চিঠিতে এই ছিল—'

কী ছিল চিঠিতে তা ছাপা বইয়ের পাঠকের অজানা নয়। চিঠির শেষে লেখা (বই এবং পাণ্ডুলিপিতে)—মিতা।

পাণ্ডুলিপিতে এর পরে সামান্য ফাঁক দিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন—

'তার পরে ছয় মাস কেটে গেছে। অমিত তখন নাসিকে, সঙ্গে কেটিরা ছিল। সেখানে লাবণ্যর হাতের লেখা এক চিঠি পেলে,—সে এক পাহাড়ের ঠিকানা থেকে, নেপালের কাছাকাছি কোন্ এক জায়গা :' এরপরে 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও' কবিতা এবং কবিতার শেষে লেখা— বন্যা।

মনে হয় উপন্যাসটি প্রবাসীতে ছাপার সময়েই প্রুফে শেষ পরিচ্ছেদটি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। প্রবাসীর পাঠ ও মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ একরূপ। ছাপা বইয়ে উপন্যাসের পরিণতিতে কী ঘটেছে তা আমাদের সকলেরই জানা। বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদে যতিশঙ্কর-অমিতর দীর্ঘ কথোপকথন সন্নিবেশিত।

'অবশেষে অমিত ফিরে এল। শহরে রাষ্ট্র, কেতকীর সঙ্গে তার বিয়ে।' 'যতি আর থাকতে পারলে না। অমিতকে নিজেই গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, "অমিতদা, শুনলুম মিস কেতকী মিত্রের সঙ্গে তোমার

~ journeybybook.com ~

বিয়ে!" অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, "লাবণ্য কি এ খবর জেনেছে?" "না, আমি তাকে লিখিনি। তোমার মুখে পাকা খবর পাইনি বলে চুপ করে আছি।" ' উত্তরে অমিত জানায় 'খবরটা সত্যি।'

এইখানে 'বিবাহ' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে যতিশঙ্করের সঙ্গে অমিতর একটা তাত্ত্বিক আলোচনা হয়। অমিত কেতকীকে ভালোবেসে ছিল, পরে শিলং-এ এসে হঠাৎই লাবণ্যর প্রেমে পড়ে। অমিতর অমিত-আকর্ষণী শক্তিতে লাবণ্যও তার কাছে নিজেকে ধরা দেয়। কিন্তু অমিতর সঙ্গে মিশে লাবণ্য বোঝে এ ঘর বাঁধার মানুষ নয়, এ আকাশে ওড়ার পাখি। কেটি সহ অমিতরা ক'দিন চেরাপুঞ্জি বেড়িয়ে শিলং-এ ফিরে এসে যোগমায়ার সেই বাসায় গিয়ে অমিত দেখে 'ঘর বন্ধ, সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনও ঠিকানা রেখে যায়নি।'

কেটিকে বিবাহ করার প্রাক্‌মুহূর্তে যতিশঙ্করকে অমিত বলে সে ভালোবেসেই কেটিকে বিয়ে করবে, কিন্তু লাবণ্যর প্রতি তার যে প্রেম তা শূন্যে মিলিয়ে যাবার নয়। প্রেম ও বিবাহ প্রসঙ্গে অমিত বলে, 'একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ ; আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্টো বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।'

আবার বলছে, 'আমি রোমান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে-স্থলেও উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা করব সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়। জয় হোক আমার লাবণ্যর, জয় হোক আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হোক অমিত রায়।... কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই ; কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর

~ journeybybook.com ~

লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি ; সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।'

অমিতর মুখে এই কথা শুনে যতিশঙ্কর একটু কুণ্ঠিত হয়েই বলে, 'কিন্তু অমিতদা, দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না?'

উত্তরে অমিত বলে, 'যার হয় তারই হয়, আমার হয় না।'

উপন্যাস শেষ হয়েছে অমিতকে লেখা লাবণ্যর চিঠি দিয়ে। পাণ্ডুলিপিতে লাবণ্যর বিয়ের কথা নেই ; মুদ্রিত পাঠে আছে 'যতিশঙ্কর লাবণ্যর লেখা একটি চিঠি অমিতর হাতে দিল। 'চিঠির এক পাতে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহের খবর। বিবাহ হবে ছ মাস পরে, জ্যৈষ্ঠ মাসে, রামগড় পর্বতের শিখরে। অপর পাতে— কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?...হে বন্ধু, বিদায়।'

রাণুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের যে দীর্ঘ আট বছরের কাহিনি, সেও শেষের কবিতা উপন্যাসের মতই যেমন প্রীতিমধুর তেমনই গভীর আকর্ষক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাতষট্টি বছর বয়সে শেষের কবিতা উপন্যাস রচনা করলেও মনের মধ্যে তখনও বুঝি তিনি ছিলেন পূর্ণমাত্রায় রাণুর সেই 'সাতাশ' বছরের যুবক। ছাপান্ন থেকে তেষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে দেড়শো চিঠি লিখেছিলেন তাতে কে বলবে এই রসিক মানুষটির বয়স সাতাশ-ঊর্ধ্ব! একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল ওই বয়সেও মনে প্রাণে কর্মক্ষমতায় সাতাশের সতেজতা নবীনতাকে ধরে রাখা। রবীন্দ্রনাথ এই বয়সেও তাঁর আকাঙ্ক্ষিত নারীর স্বপ্ন দেখেন যে-মেয়ে খণ্ডিত-রবীন্দ্রনাথকে নয়, যে-মেয়ে আবিষ্কার করবে সম্পূর্ণ-রবীন্দ্রনাথকে। রাণুর কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ রাণুকে ভালোবেসেছিলেন। অমিত কেটিকে ভালোবেসেছিল, লাবণ্যকেও। যে পারে সে উভয়কে ভালোবাসতে

~ journeybybook.com ~

পারে। সকলে পারে না, কিন্তু অমিত পারে। রবীন্দ্রনাথও হয়ত ভেবেছিলেন রাণুর বিবাহ হয়ে গেলেও তাঁর মনের আকাশে রাণুর প্রতি ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ থাকবে। হয়ত কবি ভেবেছিলেন বিবাহিত রাণুর জীবনেও তার ভানুদাদা চিরকালের মতই থাকবে দিঘির জলের মতো ; তাকে সে ঘরে আনবে না, কিন্তু তাতে তার মন সাঁতার কাটবে।

সত্যিই কি অমিত ও কেটির বিবাহিত প্রাত্যহিক জীবনের ঊর্ধ্বে অমিতর মনের আকাশে লাবণ্যের ভালোবাসা দিঘির জলের মতো চিরকাল টলোমলো করবে? কিংবা শোভনলালের স্ত্রীর জীবনে অমিত?

উপন্যাসে সেকথা বলা নেই। কিন্তু কল্পনা ও বাস্তব যে এক নয় তার প্রমাণ পেতে রবীন্দ্রনাথের বুঝি বেশি বিলম্ব হয়নি। এক তো রাণুর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের চিঠির প্রবাহ একেবারেই স্তিমিত হয়ে আসে। দুই, রাণুর বিবাহের পূর্ব মুহূর্ত থেকে আট বছরের পূর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করে রাণুকে আকস্মিকভাবে 'তুই' বলতে শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। তিন, বিবাহের পরবর্তী চিঠিপত্রে সেই গড়ে ওঠা সম্পর্কের রেশ আর কিছুমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। বিবাহের আগে রাণুর পঁয়ষট্টিটি চিঠি পাই ; বিবাহের পর কবিকে লেখা রাণুর যে ক'টি চিঠি পাওয়া গেছে তার সংখ্যা মাত্র তিন। ১৯৩৭-এ একটি, ১৯৪০-এ দুটি। একান্তই কেজো চিঠি, বলা যায় সৌজন্যপত্র। আর রাণুর বিবাহের পর ১৯২৬ থেকে ১৯৪১-এ রাণুকে লেখা কবির ছোট ছোট পত্রের সংখ্যা একচল্লিশ। স্বর্গ-মর্তের রোমান্স কল্পনায় যতটা চলে বাস্তবে তা বুঝি চলে না।

রাণুর বিয়ের আট বছর আগে রাণু-রবীন্দ্রের প্রথম পরিচয় পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে। সেই পত্রালাপ ক্রমেই গভীর ভালোবাসায় পরিণত হয়। ১৯১৭, প্রথম বছরেই কবিকে লেখা রাণুর চিঠির সংখ্যা ছয়, আর রাণুকে লেখা কবির চিঠির সংখ্যা পাঁচ। ১৯৩৩, রাণুর

~ journeybybook.com ~

বিবাহের আট বছর পরে কবিকে লেখা রাণুর একটি চিঠিও আমরা পাই না। অপর দিকে রাণুকে লেখা কবির ক্ষুদ্রাকৃতি দুটি মাত্র চিঠি পাই। দুটিই শান্তিনিকেতন থেকে লেখা। বিয়ের আট বছর পরে রাণু কিন্তু সেই রাণু আর নেই। সে তো শুধু বীরেন্দ্রের স্ত্রী মাত্র নয়, শুধু মিসেস্ রাণু মুখার্জিই নয় ; সর্বোপরি শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায় এখন পরিপূর্ণ জননী, দুটি সন্তানের গর্বিত গর্ভধারিণী। সংসার নিয়ে সন্তানদের নিয়ে রাণু এখন ব্যস্ত ঘরণী। কবিকে সেই আগের মতো চিঠি লেখার সময় অবকাশ নেই, বোধ করি আগের সেই আগ্রহ তাগিদও ক্রমেই কালচক্রে অবস্থার পরিস্থিতিতে প্রশমিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন— মুক্ত বেণীর পর যুক্ত বেণী কে কবে দেখেছে? মানুষের ইচ্ছা আবেগ আর প্রকৃতির বিধানের মধ্যে চিরকাল লড়াই চলতেই থাকে। অমিত আস্ফালন করে বলেছিল তার প্রেম ছোট্ট বাসাটিতেও যেমন সত্য, ডানা মেলে ওড়ার আকাশেও তা তেমনই সত্য এবং সুন্দর। তার প্রেমের সত্যে কেতকীও থাকবে আবার শোভনলালের স্ত্রী লাবণ্যলতাও হারিয়ে যাবার নয়। অমিত ঘড়ায়-তোলা জল প্রতিদিনের কাজে ব্যবহার করবে, আর ঘরের বাইরে যে দিঘি তার মন তাতে সাঁতার কাটবে। রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের যক্ষকে বলেছিলেন, 'তোমার তো চেতন অচেতনে পার্থক্য জ্ঞান নাই, কী জানি, যদি সত্য ও কল্পনার মধ্যেও প্রভেদ হারাইয়া থাকো।' রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনার প্রতিনিধি অমিত রায় সম্পর্কেও বোধকরি আমরা এমন আশঙ্কার কথা উচ্চারণ করতে পারি।